সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

যোগসূত্র

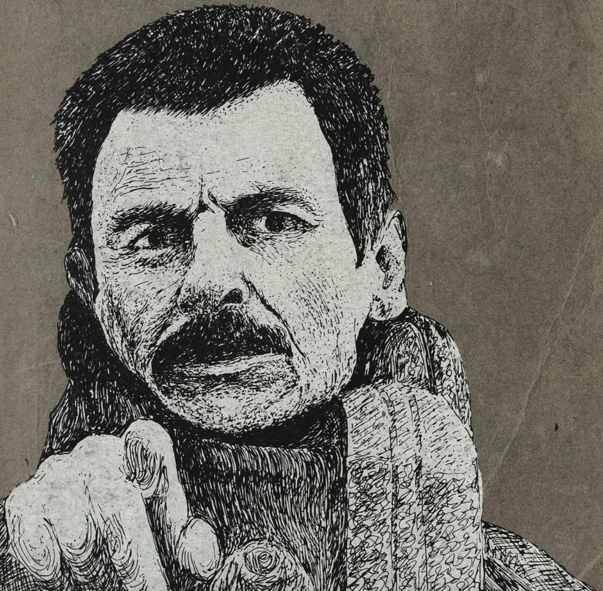

With best compliments from

P. Roy & Sons (1981)

Ph: 24 4872

গদ্যভাষার এই পত্রিকাটি সময়সূচি মেনে বছরে চার বার প্রকাশিত হবে। আমাদের কোন মতলব নেই—একথা বলব না। নিয়মের চৌহদ্দি, ব্যবসা আর যাত্রাটে হাঁকাহাঁকি থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজবে যোগসূত্র। চাতুর্যে ক্লান্ত আমরা। নিরাসক্ত মনে কাগজটা করে যেতে চাই, তাজা নতুন লেখা ছাপতে চাই। লেখকদের টাকা দিয়ে কাজে লাগিয়ে বা ফরমায়েস করে তা পাওয়া যাবে না। প্রাণের দায়েই গভীর-সহজ লেখালিখি জন্ম নেয়। আর সেই দায়, সেই বিপন্নতা এখনও মুছে যায়নি। আস্থার এই ক্ষেত্রটিই আমাদের প্রেরণা।

২৯ জুলাই ১৯৯১

প্রয়োজন অনুসারেই উন্মুক্ত হয় চেতনা

: কৃতজ্ঞতা :

স্বপন দে, গৌরী চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চন্দ্র,
সুমিত বসু, সঞ্জয় বণিক, প্রবাল দাশগুপ্ত

সম্পাদক : বিনয় ঘোষ
শিল্প নির্দেশক : দেবাশিস দত্ত
প্রচার : গোপাল বসু
বিজ্ঞাপন : মধুছন্দা সিন্‌হা
ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সেন

যোগাযোগ □
টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া
হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০০৫৯
ফোন—৫৯৪০৪৮

৯১/১এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলকাতা ৭০০০১৪

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
প্রথম বর্ষ ॥ প্রথম সংকলন
জুলাই-সেপ্টেম্বর '৯১

অজ্ঞাতবাসের পথে
অনুরাধা মহাপাত্র ৫
....

দাঙ্গা, নির্বাসিত জীবন ও মুখের মিছিল
সুবোধ দাশগুপ্ত ২৮
....

ঝুলনের হনুমান
রবি সেন ৪২
....

একটি শহিদবেদী ও একজন রাজমিস্ত্রীর ভাবপ্রবণতা
জয়ন্ত চৌধুরী ৪৯
....

১৯৯১
বিশ্ব মণ্ডল ৫৪
....

খেলা স্মরণ
বিমল চট্টোপাধ্যায় ৫৭
....

কপিকল অথবা হাওয়া মোরগ
রাহুল পুরকায়স্থ ৫৯
....

প্রসঙ্গ তারকোভস্কি ৬১—১৩৩
সিদ্ধার্থ সেন / ভাস্কর রায় / তপন মল্লিক
সোমেশলাল মুখোপাধ্যায় / দেবল বসু

With best compliments :

Manufacturers of all kinds of Rubber Goods
Specially in Foot wear & Strap, Micro Sheets :—

D. G. UDYOG

Factory : **Tangra Industrial Estate.**
Shed No. D-35 and A/9

SPACE DONATED BY :

COMPRESSED AIR ENGINEERS

7. CHADNI CHOWK STREET
CAL-700072

Phone :

Office : 274739 268724
Works : 358629

Specialist in : **Air Compressors & Drilling Spares**
Air Compressor available on hire

অনুরাধা মহাপাত্র

অজ্ঞাতবাসের পথে

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মধ্যবর্তী একটা স্মৃতির জগৎ থাকে। যা স্বাভাবিক স্মৃতির সঙ্গে যোগ রেখেও একটা প্রান্তিক অজ্ঞাতসূত্র ধরে রাখে। হাঁটা-চলা, দেখা-শোনা, রাগ-বিরহ, ক্ষুধা, অনীহার ভিতর রঙের চিহ্ন ধরে স্মৃতিকে ডেকে আনা। স্মৃতি মানেই বিষাদভারাতুর অবস্থানকে জাগ্রত করা নয়। অনেকটা বন্ধ শিরায় হঠাৎ রক্ত চলাচলের উষ্ণতা কেমন এক অধীরতা প্রাপ্ত হয়। তারপর যোগসূত্র থাকে না, আবার অন্ধকারে ফিরে যায়। কিন্তু সে অন্ধকার শূন্য, ভিন্নতর কোনো দৃশ্যের জগৎ সূচিত করে। আসলে কথা নয়, ছবির পর ছবি। আবার ছবি হারিয়ে যায়। এর ভেতরে স্বখাতসলিলে কথা, কল্পনা জন্ম নেয়। অনেকটা খেলা কিংবা ঘুমিয়ে পড়ার মতো অবস্থা।

মাঝে মাঝে ছেলেটি দৌড়ে যায় ঘরের বাইরে। উধাও হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। মুখে অদ্ভুত শব্দ, আর ভ্রূর নীচে অসন্তোষ। এরপর সে তার একলা ঘরে চলে যায়। লোকজন ভালো লাগে না। ওর মা ওর মনের অবস্থান ধরতে পারে না—ছেলে কী চায়? মা দুপুরে ঘুমোয় ওকে একা রেখে। ছেলেটি পিঠ দিয়ে দরজা ঠেলে চলে অনর্থক, আবার চলে যায় জানলার পাশে। জানলার শিক ধরে বাইরে তাকায়—গাড়ি যায়, গাড়ির ছায়া হেলে পড়ে। এখানে পুকুর নেই। শুধুই গাড়ির মুখ—আবার ছেলেটির মুখে সেই শব্দ। যেন ডিজেলের অন্ধকার থেকে কোনো অপরিচিত ধ্বনি উঠে আসছে। ছেলেটির নাম গুড্ডু পালচৌধুরী। হঠাৎ সে মাটিতে শুয়ে পড়ে নিজের মুখে মারতে থাকে—ব্যাঃ ব্যাঃ শব্দ করে। আবার স্মৃতির হানা, আবার কাকে যেন ডেকে আনা। গুড্ডুর মা দার্জিলিংয়ের মেয়ে। বটানি নিয়ে পড়াশুনো করেছে। হাই পাওয়ারের চশমা। ছেলের কথা এমন করে ভাবেনি। স্বামী চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ঈশ্বর বিশ্বাসী। দেওঘরে অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য। আলাপ হওয়ার পর তাঁকে জিগ্যেস করি, 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলে মানেন?'

'মাঝে মাঝে মানি', বলে আবার গুড্ডুর দিকে তাকায়। গুড্ডু সমানে মুখে আঙুলের আঘাত করে চলেছে। সেই বিচিত্র শব্দ—আবার গাড়ি দেখা দিল নাকি!

আমি প্রশ্ন করি, 'পুজো করেন?'

'না, চুপ করে বসে ভাবি।'

'ছেলের জন্য কিছু চান'?'

'হ্যাঁ……না……অরবিন্দ আশ্রমের কথা মনে পড়ে। এতে মন শান্ত হয়ে যায়।' গুড্ডুর বাবা কথা শেষ করে প্রায় গুড্ডুর মতো হাসেন—চকিতে তীক্ষ্ণ কিছু একটা ফালা ফালা করে দেয়। তাহলে চার্টার্ড অফিস, বিশাল ফ্ল্যাট, নিশ্চয়তা—এসবই গাড়ির মুখের মতো অনিশ্চয়। 'কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই'—এতদিনে এই গানের একটা সূঁচবিদ্ধ ফাঁক দেখা গেল!

রূপকথার রাজ্য অস্ফুট পাথরচাপা অংকুরের মতো ছেলেমেয়েদের মাথার অন্ধকারে থেকে যায়। শরীর বাড়ে অথবা কমে, কিন্তু মনোজগৎ একেবারে শৈশব আর মাঝে যুবা-প্রৌঢ়ের মাঝামাঝি অংশটাকে ছুঁয়ে থাকে। শিশুর ভিতর তাড়া করে ফেরে যৌবন যাবার মুখের সেই বিশ্বরূপ—যা তীব্র, বিশাল, অসহায়। চাপাস্নিগ্ধ একটা স্মৃতিনাটক চলতে থাকে। অপরিণত মনোবুদ্ধির অস্বাভাবিকতা আসলে স্মৃতিকথনের গোপন পৃথিবী—যা রুদ্ধ উষ্ণ রক্তচাপের মতো। রূপকথা এখানে হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকারে চলে যাওয়া ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিদৃশ্য-কথা, যার যোগ এই পৃথিবীরই কোথাও থেকে গেছে। ঐসব স্বাভাবিক মানুষের ভেতর আছে। অনেক সৃজনপ্রক্রিয়াই সারাজীবন তাড়া খেয়ে মরেছে। তাড়া খেয়ে কেউ দ্বীপে নির্বাসন নিয়েছে, কেউ নিজের হাতে বিষপাত্র তুলে নিয়েছে, কাউকে নীলাচলের সমুদ্রকে আশ্রয় মনে করতে হয়েছে। আত্মহত্যাই—তবু, হয়তো চৈতন্যদেব ভেবেছিলেন, পুরীর সমুদ্র যখন তাঁকে গ্রাস করছে,—তখন; 'বেঁচে গেলাম।'

আবার গুড্ডু চলে যায় জানলার শিকের পাশে। ওখানে পাতাবাহারের ঝোপের ভিতর একটা গাড়ি থেমে আছে, নড়ছে না। এ'দিকে ডাক পড়েছে। টানতে টানতে নিয়ে যায় গুড্ডুর মা। স্কুলের মানে প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানে যাবার জন্য পোষাক পরানো হল। মায়ের হাত ধরে সিঁড়িতে প্রথম যেন পা দিল। এখন অন্য এক গুড্ডুকে দেখা যাচ্ছে। গুড্ডুর মা, প্রায় অনাথকে যে দৃষ্টিতে চায়, সেই দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকায়। বড় এক থালা মিষ্টির প্লেট নামিয়ে দেয় দিল্লী থেকে আগত ডিজাইনার, নাগরিক, কারুকলাপ্রবণ যোগেন্দ্র

প্যাঙ্গেলের সামনে। এর মধ্যে ক্যামেরা একবার 'ক্লিক্' করে উঠল। রাতের আলো এখন ঈশ্বরের চেয়েও বেশি আকর্ষক এবং সহায়ক। গুড্ডুর মুখে আবার আজব শব্দ। মুখে মারতে মারতে আবার কোথাও উধাও!

লাইফ স্টোরি নিয়ে প্রশ্নাবলী কাঁধব্যাগেই আছে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে, বাংলা বন্ধের দুপুরে একটা অন্ধকার খুব পুরনো বাড়ি পাওয়া গেল। অঙ্কিত পোদ্দার, নাম বলতেই দরোয়ানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'চারতলায়', খানিক অন্যমনস্ক হয়ে বলল। ঢুকে দেখি বিশাল চাতাল, যজ্ঞ হোম করার মতো, বা শতরঞ্জ পেতে দাবা খেলার মতো। শ্যাওলাধরা। চাতাল পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। আলো ঢোকে না বোধহয় কোনোদিন। গা ছম্ ছম্ করে, তবু উঠে গেলাম। বাইরে তালা দেওয়া গ্রীলের দরজা। কড়া নাড়ার পরে বেশ সময় গেল। একটা বাচ্চা মেয়ে এসে গম্ভীর শান্ত মুখে বলল, 'কী চাই?'

'তোমার মা আছেন, বাড়িতে?'

'মা তো শুয়েছে।'

'বল, বিকাশ কেন্দ্র থেকে···' মেয়েটি পুরোটা না শুনেই চলে যায়। অন্ধকার থেকে এক মহিলা একেবারেই সাদা, ফ্যাকাশে—বেরিয়ে আসেন।

'কেন এসেছেন?'

'আমি অঙ্কিত এবং আপনার একটা ইণ্টারভিউ নিতে চাই।' বলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা ঝাঁকানি খেয়ে যায়। চোখে যেন কিছু জ্বলে উঠে, বিঁধে যায় সোজা আমার চোখে,

'কার ইণ্টারভিউ? আমার ছেলে দেড় বছর আগে মারা গেছে।'

আমি চমকে উঠি ভীষণ। লজ্জায় একেবারে দিক দিশাহীন হয়ে তোতলাতে থাকি '···না······মানে······আমি জানি না। বিকাশ কেন্দ্র আমায় কোনভাবে জানায়নি।' মহিলা একটু শান্ত স্বরে বলেন, 'আপনি বিকাশ কেন্দ্রে যান? গেলে, ভারতীদিকে বলবেন, আমার ছেলের আঁকা অনেকগুলো ছবি ওখানে পড়ে আছে। ওর নিজের হাতে নাম লেখা···ও যে কত···' —অঙ্কিতের মা মৃত অঙ্কিতের দুঃখে নয়, জীবিত অঙ্কিতের হাঁটা-চলা, আঁকা, কথার ক্যানভাসে চলে যায়। আমি কোনোক্রমে বলি, 'জানাবো'। আবার অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত

---

১ নামটি কাল্পনিক। মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষণের একটি প্রতিষ্ঠানকেই এই নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।—সম্পাদক।

নেমে আসি। অঙ্কিত নামের ছেলেটিকে আমার দেখাই হল না—অথচ ইন্টারভিউ।

বিকাশ কেন্দ্র কি করছে? পাগলা দাশু, বুড়ো আংলার জগতে এই ছেলেরা হয়ত মাঝে মাঝে যেতে চায়। কত্থকের নাচের ধরণে থাকা সেই মেয়েটি—যার জিভ বার করা। লালা ঝরে পড়া, চোখ উল্টোনো, বাঁকা পা, সুপুরিসাইজের মাথা—মাঝে মাঝে গা বেয়ে ওঠে। নানান ভঙ্গীর বাচ্চা, এমনসব বাচ্চাদের নাচ শেখায় নাচের দিদিমণি। সে নিজে কত্থকের ঢঙে শেখায়, কখন কাঠবেড়ালির মতো নেচে ওঠে—সেও কি জানে না অঙ্কিতের মৃত্যু? বা জেনেও তাকে পরদিন নেচে যেতে হয়েছে, জীবিত বাচ্চাদের জন্য। হিসি করায়, ধোয়ায়, চুল আঁচড়ে দেয় যেসব আয়ারা—তাদের কাছেও কি এইসব বাচ্চা একটা অভ্যাস, একটা সংখ্যা? নাচের দিদিমণি মেক্সিকো ঘুরে এসেছে। যোগী প্যাঙ্গেলের ক্যামেরা এখানেও! যদিও কত্থকের দৃশ্য-জগৎ ক্যামেরার নয়, অঙ্কিতের মৃত্যু ও বেঁচে থাকাকে মনোজগতের কত্থক মুদ্রায় ধরে রাখা।

'এসব বাচ্চাদের সেলফ্ আইডেন্টিটি দরকার', যোগীর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রঞ্জিনী বলে। ওদের সেলফ্ আইডেন্টিটি কি একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ? তথাকথিত সামাজিক জ্ঞান, সামাজিক পরিচয়পত্র দিয়ে ওদেরকে বুঝতে পারব না। ওরকম একজন বাচ্চা আর একটি বাচ্চার খোঁজে বাইরে বেরোয়, বাথরুমে যেতে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে সাহায্য করে, দিদিকে বা ভাইকে মারলে আগলায়, বাড়িতে তার প্রিয় কোনজনের মৃত্যু হলে ভীষণ একাকী হয়ে যায়, তাদের মানবিক জগৎ আমাদের তথাকথিত সুস্থতার চেয়ে অনেকবেশি প্রাণবান নয় কি? আবার শূন্য থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চায়, কোথাও চোট লাগলেও ব্যথা প্রকাশ করেনা, গান এবং কোন গভীর সুরের জগতে তাদের চলাচল আমাদের চেয়েও বেশি। ঘুমপাড়ানি গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত তাদের জগতের ভাষাকে আরো স্পর্শকাতর করে তোলে। হয়ত পরিবেশ স্বাধীন হলে তারা নতুন সুরের সংযোজন করতে পারত। সুরের ধারায় তাদের স্বভাবের একটা অনায়াস বহে যাওয়া আছে।

অঙ্কিতদের পুরনো সিঁড়ি, শ্যাওলাধরা বিশাল চাতালে হয়ত অঙ্কিতের হিজি-বিজি শ্বাসপ্রশ্বাস নড়া-চড়া করে। দেড় বছর আগে মারা যাওয়ার পরও কি সাক্ষাৎ হতে পারে, সাক্ষাৎকার নেওয়া যেতে পারে? বিকাশ কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠান, যোগীর ক্যামেরা কি দৃষ্টিবানদের মতো ততদূর অন্ধ নয়, যেখানে বড়লোকের মেয়েরা শুধু পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়? গর্ভাবস্থায় প্রতিবন্ধী

বাচ্চাদের মায়েদের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে রঞ্জিনী গর্ভপাতের কথায় আসে। তার গলার স্বর অতি স্বাভাবিক বা অভিনয়ের মতো স্বাভাবিক। সমাজে গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা তো স্বতঃসিদ্ধ। আমার বুক প্রায় শুকিয়ে ওঠে। পচা পাপড়ির মতো শিশুদের মুখ ভেসে ওঠে। এসব গবেষণা তো আসলে যাদের খুনের স্বভাব আছে, তাদের পরিচয়ই প্রকাশ করে। সান্ত্বনা, তবু, শিশু শিশু-পৃথিবীতেই আছে, তার কল্পনার ভাষা এখনও অজ্ঞাত—নইলে যে কী হত!

ট্রেনের কামরায় মনশ্চরিত্র আসলে একটার পর একটা ছবি হয়ে দেখা দেয়। এঞ্জিনে জলা কয়লা বেলচায় তোলে লোকটি—যক্ষ্মাগ্রস্ত স্বলের গলা চিরে সেই অস্বাভাবিক ধ্বনি ও স্বরতরঙ্গ বয়ে যায়, নাচও অন্তহীন, 'নদীভরা ঢেউ, জানে না তো কেউ। কেন মিছে তরী বাও, বাওরে।' তখন কি যক্ষ্মা হবার পরে, বিড়ি, গাঁজায় সামাজিক অবজ্ঞা মুছে দেবার জন্য কোন বাউল বিদেশে গেলে, বিদেশ থেকে শহরে ফিরে জিনস্ পরে গান গাইলে ধর্মহীন হয়ে যাবে? মৃত্যু ও জীবনের মাঝামাঝি হ'য়ে যাদের অহরহ বেঁচে থাকতে জানতে হয়, তাদের ধর্ম তারা আপন প্রাণশক্তিতেই রাখে, কোন সার্টিফিকেট বা অপব্যাখ্যা ছাড়াই। স্বলের গানের সামনে যে মেয়েটির শরীরছবি ভেসে ওঠে, সে তসলিম গড়িয়ালী। পার্কসার্কাসে একটা বাড়িতে তারা থাকে প্রায় সামাজিক চাপের ভিতর। কারণ তসলিম মানসিক প্রতিবন্ধী। তার বয়স তেরো। ফুলের মতো সুন্দর। সে অন্ধকার ঘরে থাকতে ভালবাসে। আর তার স্মৃতি বার বার ফিরে যায় ছেলেবেলাকার বম্বের সমুদ্রতীরে, বালুখেলায় আর সমুদ্র স্নানে। যেখানে সে বুঝেছিল, কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে—আর পাঁচটা সাঁতারু সঙ্গিনীর মতো সে জলে নামতে পারবে না। হয়ত তার মনে হয়, সমুদ্রে নামলেই সে স্নান ছাড়া আর কোন ছবি দেখবে না। তাই তীরে দাঁড়িয়ে শুধু সে স্নানের দৃশ্য দেখে যাবে। তার চোখে হাওয়া বালি ওড়ায়—মনে হয় জলের ঝাপটা। মধ্যপ্রদেশের মেয়ে। মা কমার্শিয়াল আর্টের ছাত্রী ছিল। বিয়ের পর ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু বাড়িতে সেলাইয়ের অনেক ডিজাইন আঁকে। ঘরের নানান খুঁটিনাটিতে ছড়িয়ে আছে তার আঁকার মনস্কতা। তসলিম বিকাশ কেন্দ্র থেকে ফিরে সারাদিন তার মায়ের পেছনে ঘুর ঘুর করে। রুটি বেলে দেয়, ঘর গুছোয় আর মায়ের কাছে আঁকা শেখে। মাঝে মাঝে মুখে আঙুল দিয়ে অদ্ভুত আ-আ-আ শব্দ করে। পশু মায়ের মতো কাকে যেন ডাকে। মাঝে মাঝে দিদির বেণী ধরে টান মেরে উল্টে দেয়। আবার দিদির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। হঠাৎ হঠাৎ জড়িয়ে ধরে আদর করে। তারপর গম্ভীর

হয়ে অন্ধকার ঘরে চলে যায়। টেপরেকর্ডার চালিয়ে দেয়। যে সুর বাজতে থাকে তার সাথে তাল দেয়। 'আ-আ-আ', আবার দূর থেকে পশুমায়ের তার হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাকে ডাকার, খুঁজে ফেরার ধ্বনি হতে থাকে। জাহাজের একা নিস্তব্ধ অকম্প্র দীর্ঘপথযাত্রী কাপ্তেনের কানের মতো, আমার কান সেই দিকে যায়। এদিকে প্রশ্ন করি, ওর মাকে,

'স্বামী কী করেন?'

'হোটেল ম্যানেজার, আলিপুর চিড়িয়ানার উল্টোদিকে পাঁচতলা হোটেলে। বরাবর এই কাজে গুজরাট, শ্রীলঙ্কা, কলকাতা ঘুরে ঘুরে ফেরা।'

'শ্রীলঙ্কায় তসলিম কী করত?'

'ওখানেও সমুদ্র আছে। কিন্তু খুব একা হয়ে পড়ত। বন্ধু কেউ হয়নি। আবার চলে এলাম এই কলকাতায়।'

'আলিপুরে তসলিম কেমন কাটাত?'

'বেশ বড় জায়গা ছিল, অনেক সাথী ছিল।'

'এখানে?'

'এখানে তো একেবারে বন্ধ। বন্ধ আঁখ, বন্ধ দিল।'

পার্কসার্কাস মুসলমান এলাকা। প্রাচীন এবং আধুনিক দুই। রক্ষণশীলতার সৌন্দর্য কিন্তু প্রবাসী মুসলমানদের কাছে বটের ছায়া বা নদীজল এনে দিতে পারেনি। প্রবাসীরা বরাবরই বন্ধুত্বকামী, স্নেহভিক্ষু। একটা তাড়া খাওয়ার ব্যাপারতো থাকেই। একমাত্র মসজিদে প্রার্থনার সময় তসলিমের মা তসলিমকে নিয়ে বেরোন। দিদিও সঙ্গে যায়। দিদির ছায়ায় তসলিম হাঁটে। একটা গাছের চলমান ছায়ায় মিশে আর একটা উন্মোচনহীন গাছ। পথ যদিও 'গুরুতে, মুর্শেদে নয়', তসলিমকে উৎসুক জনতার 'পাগলী', 'খাসা', 'শাদি' কখন হবে না আর নানান ইত্যাদি, প্রভৃতির ভেতর দিয়ে মসজিদে, বিকাশ কেন্দ্রে যেতে হয়। অপ্রকৃতিসম্পন্না তসলিম স্কুল বাসে যখন যায়, তখন গুড্ডু, কুণাল, অমিতদের অভিভাবিকা শাসন করে, আদরও। একঢাল পিছছাপানো চুল, সাদা ফ্রকপরা তসলিম ওই 'আ-আ-আ' শব্দেই কলকাতা এবং সাথীদের শাসন করে চলে। কিন্তু সে বোঝে না—তার সাথী সত্যি কেউ আছে কিনা। গুড্ডু হঠাৎ বাসের দরজা খুলে দৌড়ে নামতে চাইলে তসলিম ব্যস্ত হয়ে আটকায়। গুড্ডু বোঝে মার মতো নয়, কিন্তু ওরকম মূর্তি এই সাথীর ভিতর কোথাও আছে। গুড্ডুর মুখে আঙুলের অস্থির আঘাত পড়ে। ফিকে হাসি দেখা দেয় তসলিমের মুখে। সেই তসলিম, আমি যেতেই ঘুম থেকে উঠে আসে। তার অনেক প্রশ্ন আমার

প্রতি। একটু পরখ করার মতো ঝুঁকে কাছে আসে, তারপর দূরে সরে যায়। তসলিমের মা বলে ওঠে,

'ও ভেবেছে আপনি বিকাশ কেন্দ্রের দিদিমণি। দিদিমণিদের ও খুব ভয় পায়।'

এখানে কোন ক্যামেরা নেই। তসলিম শুধু আমাকেই ছাখে। হেসে ফেলে তার অন্ধকার ঘরে আমায় নিয়ে যেতে চায়। সে আমার হাত শক্ত করে ধরে। শুধু অন্ধকার ঘর একবার দেখে ফিরে আসি। তসলিম একা বিমর্ষ মুখে তার ঘরে চলে যায়। আমি নিরুপায় হয়ে জানলার দিকে তাকাই।

বাজনার স্বর কানে আসে। বোঝা যায় আত্মীয়তা আবার মেয়েটির ভিতর হানা দিয়েছে। রুটিবেলা, আঁকা, বাসযাত্রার ভেতর শাসন-আদরের আত্মীয়তাটুকু সে হারাতে চায়না। মাঝে মাঝে তার জগৎ থেকে হারিয়ে যায়—তার প্রতিবন্ধকতা এই। আবার সমুদ্র স্নানের জল ও শিশুসাথীজগৎ যদিও ক্ষীণ, তবুও তার সম্বল। তসলিমের মাকে জিগ্যেস করি,

'এরপর ? ওকে নিয়ে কি করবেন ?'

'কী করব জানি না। আমরা মরে গেলে ওর দিদি হয়ত দেখবে।'

'কেন, শাদি ? শাদি দেবেন না ?'

'কে শাদি করবে ? আর কী করে তা সম্ভব ? যে আপনা কিস্মৎ আপনি জানে না। নিজের চিন্তাও নেই।'

'কিন্তু আপনাদের সমাজ ?'

'সেহি তো ওর আব্বার ভাবনা।' এরপর তসলিমের মা কিছুক্ষণ চুপ হয়ে যায়। পরে বলে ওঠে, হঠাৎ এই ভাবনা থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য—'ওর আব্বা আবার কোথাও ট্রান্সফার হয়ে যাবে, তখন আবার কিছুদিন আচানক থাকা যাবে।'

ভয়ে শিউরে উঠি তসলিমের কথা ভেবে। শাদী হলেও এই মেয়ের ওপর অত্যাচার হবে। আর শাদী না হলেও সামাজিক অত্যাচার, অপমানের হাত থেকে রেহাই নেই। সারাজীবন তাড়া খেতে হবে দেশ-দেশান্তরে। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে শেয়ালদা স্টেশনে সাত থেকে ষোল বয়সী মেয়েরা—যারা মানসিক প্রতিবন্ধী। যাদের মাঝে মাঝে রাতে উধাও করা হয়। অনেকে মৃত অনেকে ঘোর উন্মাদ—পথে পথে যাদের দেখা যায়। একটা বীভৎস আতঙ্কে আমি তসলিমের মায়ের দিকে তাকাই। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। আমি ঝটিতি উঠে পড়ি আর সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে আসি।

এন্টালির গলির ভেতরে খুঁজে-খুঁজে সঈদা বেগমের বাড়ি পাই। এই মেয়েটিকে দেখে দীপকদার কথার কোন বন্য শোকছন্দ খুঁজে পাই। বা বলা যায়, শোক ও বেঁচে থাকার মধ্যবর্তী কোন ছন্দ—যা পৃথক পৃথক আকাশ, গ্রহ, তারা হয়ে ছিটকে যায় দূরে, আবার বেঁচে থাকার প্রাচীন কোন টানে এখনকার পৃথিবীর সংঘাতস্পন্দনে গ্রথিত করে। তের বছরের কিশোরী সঈদাকে দেখে সেই বন্যতার চলমানতা একবার আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায়। বুনো ঝাঁকড়া চুল, কিন্তু ঘাড়ের কাছে ছাঁটা। একটা আলখাল্লার মতো কুর্তা গায়, কচমচ করে পান চিবোতে চিবোতে মেয়েটি আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখে, ঘাড় ঝাঁকায়। এখানে সবই মুসলমান পরিবার। একটা গলির ভেতর অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর। সঈদা দৌড়ে যায় ওর মাকে খবর দিতে। এই মুখ গুঁজে পড়ে থাকা মানুষদের অস্তিত্বের কতগুলো সুতো খুঁজে বেড়ানো যায়। কিন্তু পুরোপুরি ধরা যায় না। এত বিচিত্র চিড়ধরা মনোপ্রকৃতি, এত ভিন্নগামী যে, চিহ্নিতকরণ সম্ভব নয়। এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলে এরা প্রায় ছোট ছোট লোকশ্রুতির মতো বেঁচে থাকবেন, হয়ত। সঈদার মা এসে গেছে। হেসে পরিচয় দিই। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার হাসি মুছে যায়। এত প্রশ্ন, এত ধিক্কার সেই চোখে—বুঝে উঠতে পারি না। শুধু স্বর শুনি, 'কী চান ? আমার মেয়ের নাম বিকাশ কেন্দ্রের খাতা থেকে কেটে দিয়েছে। এত সাধলাম। গরিব মানুষ। কোথায় রাখব ? কী করব, কে দেখবে, আমি আমার কাজে চলে যাই। শুনল না।' এতক্ষণে বুঝতে পারি। বিকাশ কেন্দ্রও গরিব মানসিক প্রতিবন্ধী, বিত্তবান মানসিক প্রতিবন্ধী চেনে ! মানসিক প্রতিবন্ধীরও আবার শ্রেণী বিভাজন ! বিকাশ কেন্দ্রের তিনতলা থেকে সেদিন একটি ছেলে দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছোট ছেলে তাকে খুঁজতে চলে আসে। সে বোঝে, বিকাশ কেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে যত্ন নিতে জানেনা, আবার বাইরে রাস্তায়ও কেউ তাদের ছেড়ে দেবে না, স্বাভাবিক চোখে দেখবে না—যে ভালোবাসার চোখে ছোটদের সবাই দেখে, তা তাদের ভাগ্যে নেই। অপরিণত মন, প্রতিবন্ধী বাচ্চারা লোকের চোখে অনেকটা জারজ শিশুর মতো—করুণা, দূরত্ব, মস্করা, নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নেই। মা বাবারা আবার সেই সমাজে বাচ্চাদের সামাজিক করে তোলার চেষ্টা করে যায়। সারাজীবন বাচ্চাদের সঙ্গে অভিনয় করে যায়। যদিও এটা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সমাজেই বেশি। আশ্রয়হীন, নানান অবস্থানে তাড়া খাওয়া সঈদা বেগমের মা নয়। তাদের অন্তত আত্মসম্মান আছে, অভিমান আছে, আর বাচ্চাদের প্রতি নিরভিনয়

ভালবাসা ও ক্রোধ সমানভাবে আছে। মাথা নীচু করে সঙ্গীদার মায়ের ভর্ৎসনা শুনে নিই, সয়ে নিই। খুলে বলি তাকে, আমার বর্তমান অবস্থার কথা, চাকরি যাবার কথা। আস্তে আস্তে তার চোখের দৃষ্টি শান্ত হয়ে আসে। সঙ্গীদা শুধু ঘুর ঘুর করে আমার চারপাশে। এবার আমার হাত ধরে খাটে বসায়। একে একে গল্প হয়, আমার দেশের, সঙ্গীদার দেশের। সঙ্গীদার মা অবিভক্ত পাকিস্তানের। চট্টগ্রামের মেয়ে। একটি ছেলের প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে পালিয়ে আসে কলকাতায়। কারণ বাড়ির মত ছিল না। শাদি হয় এখানে। পাকিস্তানে দাঙ্গার পরে উদ্বাস্তু, আত্মীয়-স্বজনরা এসে এখানে স্বামীর বাড়ি দখল করে। পরে সঙ্গীদার মা বাবা এই বাড়ি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সঙ্গীদার বাবা রাজমিস্ত্রি। হন্যে হয়ে ঘর খুঁজতে খুঁজতে এন্টালির গলি। এখানেই সঙ্গীদার জন্ম। জন্মদিনের অনেক ছবি দেখায় সঙ্গীদার মা। ফুলে ভরা, স্বাস্থ্যে লাবণ্যে ভরপুর একটা বাচ্চা। সঙ্গীদার মা ভাবতেই পারেনি সেই বাচ্চার ভবিষ্যৎ এমন দিকে যেতে পারে। সঙ্গীদার স্বাস্থ্য এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ ঈষৎ সুর্মা টানা। শুধু ডান বাহু ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। হঠাৎ এসে আমার কোলে মুখ গুজে হাঁটু মুড়ে বসে রইল। 'তুমায় যেতে দেওয়া হবেনা' বলে, কোলে মুখ ডুবিয়ে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। আমি হকচকিয়ে যাই। এমনটা ভাবিনি। একটা গভীর কিছু নাড়া দেয় আমায়, আচ্ছন্ন করে একটা ব্যথা বোধ। যে মেয়েটিকে কিছুই দেবার নেই আমার। আমি ইন্টারভিউয়ার, দর্শক! কিছুক্ষণ পরে চলে যেতে হবে। এই মেয়েটির সামনে সবটাই অচিহ্নিত, অনিশ্চিত। নাড়া খেয়ে যেন জেগে উঠি। বোঝাতে চেষ্টা করি। ওর মা টেনে সরায়। 'দিদিকে চা দে, গেলাসে করে', বলে। ঝটিতি উঠে দাঁড়ায়। বড় বড় চোখ করে আমায় দেখে। তারপর মাথা নীচু করে খাটের নীচে ঢাকা গেলাস তুলে নিয়ে আমার হাতে দেয়। ফেরার পথে গলি ঘুরে অন্ধকার ছাড়িয়ে কালো একটা ঘুড়ির মতো মাথা দোলাতে দোলাতে সঙ্গীদা বলে যায়, 'তুমি আসবে তো···আবার তুমি···আসবে তো?'

এই অব্দি এসে, গলির নিষ্প্রভ আলো, জমাট শব্দতরঙ্গ, দৃশ্যবসতি তাড়া খাওয়া থেকে মুক্তি দেয়। শিয়ালদার মুখে মোড় নিতেই অনেক ধাতব, জটিল মুখে পশুব্যক্তিত্ব। আবার তাড়া খাওয়ার একাকীত্ব ছেঁকে ধরে। ঐ মুহূর্তে আমি ইন্টারভিউয়ার নই, কবিতালেখক নই, দর্শক নই—আমাকে পালিয়ে যেতে হবে এই ধাতব-পাথর জগৎ থেকে, লেখকদের আড্ডা থেকে, কর্মীদের দ্বন্দ্ব থেকে, বিরহ থেকে, চলে যায় গোছের চোখের দেখা সামাজিক করুণা থেকে। আমিও

তাড়িত, ছিন্নমূল। ঈশ্বরের দিকে ধাবমান আমার নৈরাজ্যবোধ। নারী স্বাধীনতার পদাধিকার পাওয়ার ঝোঁকও আমার নেই। আমি শুধু মানুষ। দেশান্তরী।

'সব মানুষেরই পাগল হওয়া উচিত, অথবা উন্মাদ হওয়াই আনন্দ'— হেরোইনে নেশাচ্ছন্ন, ঘন ঘন ইংরেজী বলা একজন বলে উঠলে, আমি বিস্মিত হই। বলি, 'নিজের বাড়িতে কাউকে পাগল হতে দেখেছেন? অনেকদিন তাদের কাছাকাছি কাটিয়েছেন?' ছেলেটি স্মার্টলি অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। তারপর অ্যাসাইলামে থাকা ও হাংরিতত্ত্বমেশানো একটি লেখা পড়তে থাকে। বুঝতে পারি, এর দৌড় বই পড়া, নেশা করা এবং একটা পচা তত্ত্ব অব্দি। এখান থেকেই প্রায় উন্মাদকে পড়তে শিখেছে। ঠাস্ করে একটা চড় লাগাতে ইচ্ছে করে। কোন কাছের মানুষ পাগল হলে, তা যে কি মর্মান্তিক যন্ত্রণার, রাতদিন। যে পাগল হয় তার যন্ত্রণা, যে কাছে থাকে, বেশি যন্ত্রণা তার। লোকের তামাশা, ঘৃণা কোথায় গিয়ে পৌঁছায়—তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। কিন্তু উন্মাদ জগতের একটা ভাষা আছে, তা বিচ্ছিন্ন দুঃখেরও নয়। আনন্দেরও নয়। তার স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। তার অস্ফুট ব্যঞ্জনাগুলি, তার উন্মেষের ইচ্ছা, তার ধ্বনিতরঙ্গ, শরীরছন্দকে যাতায়াতের পথ করে দিতে হবে। তারজন্য আমাদের প্রশ্নশীল, ধৈর্যশীল, ভালবাসা সক্ষম প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে এদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। যোদ্ধা, ভবঘুরে, সুফি, ফকিরদের, লোককারিগরদের পথসন্ধান বলতে পারি। তাঁদের চলা এইদিকেই।

এমনটা হলে সঈদা বেগম, তসলিমের পথ অনেক সহা-বহার আনন্দ পেত। কিন্তু সমাজ ও লোকপ্রকৃতি একভাষা নয়, এক অবস্থান নয়। এই দ্বন্দ্বে আরও প্রশ্নের ভিতর নিয়ে গেলে, কমলকুমার মজুমদারের 'তাহাদের কথা'-য় জ্যোতি আর তার দিদি তার বাবাকে খুঁজে বেড়ায় আর মাঠের প্রান্তে তার বাবা নরকপালে মুখ ঢেকে শ্যামাসংগীত গায়, কামারশালে কারিগর লোকটি জ্যোতির মায়ের সামনে জ্যোতির পাগল বাবার জন্য শেকল তৈরি করছে, আর ঘুম ভেঙে জ্যোতি দেখার চেষ্টা করে, তার দিদি, তার বাবার পায়ে শিকল পরিয়ে 'তালা লাগাতে ব্যস্ত', এই দৃশ্যগুলি মাথার ভিতরে বার বার প্রবল ঢেউ-এর মতো এসে আঘাত দেয়, তারপর আছড়ে পড়ে, কিনারাহীন কালো সমুদ্রে। রাজনৈতিক জনগণ মেশিন প্রসেসের সঙ্গে থেকেও মেশিনের উল্টোদিকে আর একটি মুখ, আর একটি সন্ধান দিতে শুরু করেছে। প্রান্তিকপ্রকৃতিবাস্তবতা আমাকে সমস্ত প্রশ্নাকীর্ণ পথে প্রাণগুলিকে চিনে নিতে সাহায্য করে। এর জন্য, এমত

জটিল পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকতে পারছি। ‘সুহাসিনীর পমেটম’-এ যে মেয়েটির গাল চমকায় আর তার শিশুটি আঁকা নয়, আমাদের কোথাও না কোথাও সত্য।

পুরনো বন্ধুরা সরে যাচ্ছে। আর আমার ভূমিকাটা অনেকটা বিস্মিত প্রশ্নকামী বকের। সমস্ত সম্পর্কগুলি জটিল সুবিধামায়ার দিকে, তবু ভালবাসার ইচ্ছা থেকে যাক—এ এক অবাধ্য নিষ্ঠুরতা। অতি কর্কশ মধ্যবিত্ত জগৎ পাগলকে পাথর ছোঁড়ার মতো সমস্ত মানুষকেই ঠাট্টা ও করুণায় নিয়ে যেতে পেরেছে। এটাও প্রায় এখন প্রচলিত। আবার ঘুরে আসি গুড্ডুর মায়ের কথায়, ‘একটা বাচ্চাকে তার মা নর্ম্যাল স্কুলে দিয়ে আসত। সেই স্কুলে বাচ্চাটি ঘুমিয়ে পড়ত। একবার পেচ্ছাব করে ফেলে। সেই থেকে লুকিয়ে, স্কুল চলাকালীন শিক্ষিকারা রোজ সেই বাচ্চাটাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত। ছুটি হলে দরজা খুলে বের করে নিয়ে আসত, কেউ টের পাবার আগেই। একদিন বাচ্চাটির বাড়ির আয়া এসে দেখতে পায়।’ গুড্ডুর মায়ের মাইনাস পাওয়ারের চশমা আর গলায় স্বর ক্রমে ভৌতিক লাগে। আমি ভাববার চেষ্টা করি, দরজা বন্ধ থাকাকালীন বাচ্চাটা বাথরুমে কী করত? কাঁদত? মাথা ঠুকত? ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করত? এক কোণে মুখ গুঁজে বসে থাকত, ভয়ে? গিরগিটির মতো জানলা, দেয়াল বেয়ে বেরোবার পথ খুঁজত? নাকি তার মায়ের মুখ বা আর কারো মুখ মনে করে মনে-মনে একটা অবলম্বন পেত? জানিনা। আর যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যেত। মুহূর্তে আমার সমস্ত রক্ত চলাচল যেন থেমে যায়। সংবাদপত্রে ছবিসহ বেরোত। কিন্তু কেউ তো সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে বেরোনোর বাইরে বেঁচে যায়। এই ঘটনা কি আমার মাথার ভিতর ক্রমাগত পেরেক ঢুকিয়ে দিচ্ছে না? এখানে কি আমি সমাজকর্মী? এর বাইরে আমার কী করার আছে? বাচ্চাটির মা বা সেই স্কুল শিক্ষিকা—আমি যদি হতাম, কী করতাম, নিজের টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে হয় বেদের হাতে টুঁটি চেপে ধরা সাপের বিষদাঁত ভেঙে যাবার মতো। এই বিষ আমি কিছুটা ঝেড়ে ফেলতে পারি, সবটা নয়। মধ্যবিত্তদের আধভাঙা বিষদাঁত বয়ে বেড়াতে হয়। আমি এমন মধ্যবিত্ত হতে চাইনা। কসবার অনিন্দিতা যখন কোথা থেকে ক্ষ্যাপার মতো এসে আমার কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল এবং সজোরে চুলের মুঠি ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলতে চেয়েছিল, তখন তার বাবা-এসে ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটিকে একবার শূন্যে তুলে নামিয়ে ঘরের বার করে দেয়।

তখন একটা অসহায় অবস্থা দেখা দেয়। এটা একটা মানসিক প্রতিবন্ধী বাচ্চার পক্ষে চূড়ান্ত নির্মমতা। ইতিমধ্যে অনিন্দিতার মাও এসে গেছে। দুজনে চেয়ারে বসেন। এতক্ষণে একটা জ্যামিতি রচিত হয়েছে। এরপর অনিন্দিতার বাবারগলা শোনা যায়, 'আগে বাবা-মাকে লিবারেল হতে হবে, তাদেরই আগে মানসিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে হবে। আমরা এদের দিয়ে যৌথখেলাধুলোর প্র্যাকটিস করাতে ভিক্টোরিয়ার মাঠে নিয়ে যাই' ইত্যাদি, ইত্যাদি শুনে যাই।' চেয়ারের সঙ্গে প্রায় চেয়ার হয়ে যাওয়া। এ মুহূর্তে অনিন্দিতা যদি চেয়ারটা সরিয়ে নেয়। পরমুহূর্তে অনিন্দিতার ক্ষিপ্র বেগে প্রবেশ এবং কিছু বোঝবার আগেই, ঘরের সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। আমার খাবারের প্লেট থেকে থাবা মেরে ডিমভাজা তুলে নেয়। সারা ঘরময় লাফ দিয়ে পড়ে ডিমভাজা খেতে থাকে। একে এখনই এই চারতলা সরকারী ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে ঝুপড়িবাসী পথবাসী মা ও বাচ্চাদের মধ্যে। ছেড়ে দিতে হবে কোন দ্বিরুক্তি না করেই। একমাত্র তারাই ওর কাছাকাছি আসতে পারে। তাদের অভুক্তি, তাদের মুক্ত স্বভাব, মেয়েটিকে মানবিক দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং তাদের বন্ধুত্ব প্রতিবন্ধী মধ্যবিত্ত গোলকধাঁধার বাইরে কোন স্বাভাবিক পথে নিয়ে যেতে পারে। বলার ইচ্ছে থাকলেও বলা হয় না। কেননা ওই ফ্ল্যাটবাড়ি, কাঠের সঙ্গে কাঠ হয়ে যাওয়া অনুভূতিগুলি আমার গলা চেপে ধরে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ কোন নস্টালজিয়া নয়। বহুদিন ধরে দেশান্তরী, বহুদিন ধরে এই শহরে বাস। সংস্কৃতি, প্রেম, সামাজিক কাজ, লেখালেখি, অভুক্তি মেটাতে কিছু খাওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উল্টোদিকে প্রায় উল্টানো পাঁচনম্বরের মতো হাসি, যা কিনা কবির, যা কিনা অফিসের। যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার কোন প্রেরণা নেই। শুধু নিজের মুখ ক্রমে ম্লান হতে থাকে, ম্লানতাকে ঢাকার জন্য কিছু অন্ধকার খুঁজতে হয়, আর 'হঁ্যা···না মানে হঁ্যা···এরকমই তো হয়' এরকমই হতে হয়।' চারিদিকে কবি। তোতলাতে তোতলাতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ফেলি। এমতাবস্থায় নিজের ব্যর্থতাবোধ ঢাকতে টেবিলের পায়ার কোন সামান্য অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

গ্রামে পাগল, ক্ষ্যাপা, অর্ধবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা মা, ঠাকুমা, পিসিমার আশ্রয়ে থাকত। পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপ, শিবস্থান পীরদরগা—এসবের সঙ্গে মিশে থাকত যদিও বঞ্চনা তাদের ভাগ্যেও জুটত। তবু এতটা বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েনি। অপরিণত বুদ্ধির ছেলে-মেয়েদের বিয়েও হত। তাদের স্ত্রীরা অনেকটা বেশি স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে সম্পর্কটাকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করত। এখন গ্রামও বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতায় আক্রান্ত। ডুবো মানুষকে চুলের মুঠি ধরে

ডাঙায় তোলার কারো মন নেই। তবু ঠাকুমা, জেঠিমা, ঠাকুর্দার একটা প্রবহমান স্মৃতিজগৎ থাকে, যা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কিছু না কিছু থেকে গেছে। আর আমরা তো আদিবাসী প্রবাহের উত্তরাধিকারী, তাই রক্তের ভিতর এসব মানুষের প্রতি ভালোবাসা বয়ে বেড়াই। শহরে কেউ কেউ এদের জন্য বেদনা অনুভব করে, কিন্তু শহরের সামাজিক নিয়ম মানুষকে রক্ষা করার, আশ্রয় দেবার স্থির অনুভব সঞ্চার করতে দেয় না মানুষের ভেতর। শুধু যন্ত্রণা বাড়ায়, শুধু বিচ্ছিন্ন করে। প্রতিদিন স্টেশনে, পথে লক্ষ জনস্রোতের ভিতর দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে গ্রাম ও শহর, পরস্পরকে বুঝতে হয়েছে। ভিখিরি, পাগল, হাবা, আধ পাগলদের থেকে আলাদা থাকার সুবিধা পেতে চেয়েও আলাদা থাকতে পারছে না। বরং অতি স্বার্থপর লোকেরাও প্রতি চোখে ও মনে আক্রান্ত হতে হতে বুঝেছে। ক্রমে তারা সহনশীল হতে শিখছে এবং তাদের নেতিবাচক উপেক্ষা অনেকটা কাছাকাছি আনতে পেরেছে। কারণ তাদের নিজের পরিবারেও এই ধরণের শিশু ও বড়রা আছে। তাদেরকে কিছুটা সইয়ে নিতে গেলে, তাদের বাবা, মা হতে গেলেও অন্তত স্বাভাবিক সত্যের খাতিরে এদেরকে কিছুটা স্বাভাবিক চোখে দেখতে হয়, পাশাপাশি চোখে চোখ রেখে হাঁটতে হয়। এই বুনন থেকে যারা বিচ্ছিন্ন, তারাই ঐ নর্মাল স্কুলের শিক্ষিকা যাকে তার নিজের পজিশন রাখার জন্য একটি শিশুকে বাথরুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ করে রাখতে হয়। হয়ত এই শিক্ষিকা নিজের বাড়িতে নিজের শিশুর মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতে ভয় পায়। বড় বড় বাড়িতে কুকুরকে স্নান করানো হয়, আদর করা হয়, কিন্তু প্রতিবন্ধী মানুষ এই সম্মানও পায় না। মানুষের ইচ্ছা কিংবা শুভেচ্ছা, সবই দেয়ালের এপারে। দেয়ালের ওপারে গিয়ে পৌঁছয় না। আমরা কেউই এই দেয়াল সরিয়ে দিতে পারিনি। বার বার খণ্ড খণ্ড হওয়া। সমগ্রের দিকে কোন অভিপ্রায়, কোন দৃষ্টি নেই। যেমন রাজনৈতিক সমাধানসূত্র, 'খুনের বদলা খুন', যা সৃজনশীলতার বিরুদ্ধে বিভাজনকামী। জাতি স্বাতন্ত্র্য রেখেও লোকসাধারণী উপায়ে সকল মানুষের, সকল সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যের যোগসূত্রে পৌঁছনো যায়—যা যে কোন প্রাণকে, প্রাণের ব্যঞ্জনাকে সর্বদাই আমন্ত্রণ জানাতে ইচ্ছুক। একথা প্রায়শই অনুভব করেও দেখতে পাই, 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি। আজ চোখে দেখে তারা।'

কুণাল সিংহ ডুগারের বাড়ি লোয়ার সার্কুলার রোডে দেওদার স্ট্রিটের পাশে, খুব পুরনো, ইংরেজ আমলের বাড়ি। কাঠের সিঁড়ি ও বারান্দা। ইংরেজ আমলে

বিজয় সিংহ ডুগারদের পরিবার। একদা মুর্শিদাবাদে বসবাস। তারপর অনেক পথ ঘুরে এখানে। কুণাল এই পরিবারের ছেলে। তার জেঠামশাই শান্তি সিংহ ডুগার কোনভাবেই ভাবতে পারে না, ডুগার পরিবারের ছেলে মানসিক প্রতিবন্ধী। সিরাজউদ্দৌলার আমল দেখেছে এই পরিবারের পূর্বপুরুষ। যারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি করেছে আবার গোপনে ইংরেজ বিরোধী রাজবিদ্রোহী বাহিনী তৈরি করেছে। জমিদারি গেছে। শুধু এই প্রাচীন বাড়ি টিকে আছে। সেই পরিবারে বিদ্রোহীর পরিবর্তে প্রতিবন্ধী জন্ম নিয়েছে। ঘরের বাইরে বারান্দায়, যেখানে সেখানে পাথরের রুক্ষ মূর্তি যেন—চলাফেরা করে অস্থিরভাবে এই পরিবারের খয়েরী-লাল চুলের পুরুষরা। কোল্ড ড্রিংকসের দোকান ও কারখানার ম্যানেজারী—এই তাদের হাল-হকিকৎ।

কুণালের প্রিয় ফুটবল। বাগানে অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলে বেড়ায় কুণাল। হঠাৎ তাকে দেখা যায় পাঁচিলের ওপর, গাছের ডালে চড়ে বসে আছে। নামছে না। সন্ধ্যায় ছেলেরা এসে খোঁজ দিয়েছে বাড়িতে। কখনো কখনো দেখা গেছে লোয়ার সার্কুলার রোডে দাঁড়িয়ে হাত তুলে গাড়ি থামাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। হো-হো করে হাসছে। আমাকে কিছুটা চেনে। দেখে একটু অন্য হাসি দেখা যায় তার মুখে। সে বিকাশ কেন্দ্র, কিংবা ডুগার পরিবারের কেউ নয়, যেন সে হঠাৎ বাইরে থেকে এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর কথা মনে পড়ে যায়। তারাপদকে আমরা কাছে পেয়েও পাইনি। সে, হঠাৎ এসেছিল—সে হঠাৎ চলে গেছে, এক ঝড়ের রাতে। কুণাল সেরকম আর এক তারাপদ, যে একেবারে চলে যায় নি সংসার থেকে, শুধু কখন তাকে রাস্তায়, কখন গাছের ডালে, কখন তাকে খেলায় দেখা গেছে। কখন তাকে বিকাশকেন্দ্রের সিঁড়িতে। বলা ভাল, তার মতো সে বাঁচতে শিখেছে। তার ভাষা সে কাউকে হয়ত বোঝাতে পারছে না। এখন এই প্রতিবন্ধী কিশোর কোন্ অর্থনীতির ওপর দাঁড়াবে, ডুগার পরিবারের কর্তারা তারই ভাবনায় পড়েছে। কুণাল যদি খেলা ভালোবাসে, ভবিষ্যতে তার জন্য অর্থ চাই। কুণালের জেঠামশাই একবার গম্ভীর মুখে পিতৃ-পিতামহের সিঁড়ি বেয়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির দিকে ফিরে যান। দেখতে পান, সিরাজউদ্দৌলা একটু ঝুঁকে পড়ে ভাবছেন, বাংলা তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কারা? জগৎ শেঠরা, না ইংরেজরা। উচ্ছৃঙ্খল নবাবের চেয়ে বিদেশী টাকা, সাদা চামড়া অনেক ভাল, ভেবেছিল সেকাল, আর একাল চেয়ে আছে বিশ্বব্যাংকের দিকে। পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ প্রতিবন্ধী, ইংরেজের ভাষায় যাকে বলে ডিসেইবলড্। প্রকৃতি এবং অন্তর্জগৎ মিলিয়ে যে শিশুরা প্রায় অথৈ নদী তাদেরকেও মাপা

হবে বিশ্বব্যাংকের দাঁড়িপাল্লায়। আমরা সময়ের পরিবর্তন ও জটিল টানা-পোড়েনের সঙ্গে লোকপ্রকৃতিকে মিলিয়ে নিতে পারিনি। যে যোগ থাকলে পরে এমন করে প্রাণের বিরুদ্ধে, আত্মঘাতের স্বপক্ষে মানুষ যেতে পারত না। প্রতিবন্ধী সমাজ, হরিজন সমাজ, দলিত সমাজ, লেখক সমাজ, পার্টি সমাজ— এরকম, গান্ধারীর অখণ্ড গর্ভ কেটে খণ্ড খণ্ড গর্ভপিণ্ডের মতো সমাজের জন্ম হতনা। এই দেখে যাওয়া, সয়ে যাওয়া, 'না এলেই ভালো হত অনুভব করে। এসে যে গভীরতর লাভ হল সে' সব বুঝেছি।'

ছেলেবেলা থেকেই নাথ, কাহারদের ছেলেমেয়েদের যক্ষায়, জণ্ডিসে মারা যেতে দেখেছি। গর্ভপাতে মরতে দেখেছি মেয়েদের। 'ওদেরতো ওরকম হয়ই', এরকম কথা শোনার পরে, এত মৃত্যুর পরেও তারাই জীবনের সবচেয়ে নিকটে থেকে গেছে। তাদের একটুকরো ভিটে ভরে রয়েছে আম, জাম, শিরীষ গাছে। জবা ও ঝিঙে ফুলে উঠোন ভরে গেছে। বিছানার পাশে কালো চোখে গাভী আর তার দুধের ধারা। আর সন্ধ্যায় তাদের বাচ্চাদের জোনাকির সাথ ওড়াউড়ি, জামার ভিতর প্রদীপ জ্বেলে, হাওয়া থেকে বাঁচিয়ে পুকুরের জলে কলার ডোঙায় ভাসিয়ে দেওয়া। এসবতো তাদেরই পৃথিবী। আর আমার মায়ের শ্লেষ্মা হলে গাছ শেকড়ের রস দিয়ে ওষুধ বানিয়ে দিত নাথবউ। অসুখ বাড়াবাড়ি হলে ঝড়জল ঠেলে ডাক্তার ডেকে আনত, সারারাত ধরে ঘুঁটে জ্বেলে ঠাণ্ডা শরীরে সেঁক দিত। উদ্বেগে চেয়ে বসে রাত জেগে কাটাত। সেই ভালোবাসা আর কোথায় আছে ? কিন্তু এখনও, তারাই 'অন্ত্যজ', 'হরিজন', এই পরিচয়েই আমাদের কাছাকাছি থেকেও আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে আছে। এরাই আমাদের অগস্ত্য। বিদেশীদের মতো শাসন করে সমুদ্রকে থামায়নি, দূরে সরিয়ে দেয়নি, এক গণ্ডুষে পান করে নিজের ভেতরে নিতে পেরেছে চিরকাল। প্রান্তিক আত্মীয়দের এভাবে সহজ অনুভবের ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের কাছে টানতে পারিনি। এরকম কোন আলো আমাদের দৃষ্টি এখনও পায়নি। তাই প্রতিবন্ধী, দলিত, লেখক, হরিজন, বাউল হয়ে থেকেছি, সত্যের অপলাপ করে চলেছি। যে অনুভূতিতে পৌঁছে মতিলাল পাদরী বলতে পেরেছিল, 'আমি সত্যই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ্।' অথবা কি কমলকুমার মজুমদার নিজেই এই সত্যের আলোয় পৌঁছেছিলেন ?

মুখে লালা ঝরছে, চোখ আধ বোজা, গলার কাছে নীল শার্ট ভিজে উঠেছে, বছর এগারোর ছেলেটি মজার সরল হাসি হাসে। 'অমিত' বলে ডাকার পর

কিছুক্ষণ কেউ নেই। তারপর ছেলেটি উঠে আসে। আবার সবার দিকে তাকিয়ে সেই হাসি হাসে। তার গলায় কালো সুতোয় বাঁধা ছোট্ট একটা ঘুঙুর মৃদু বেজে ওঠে, ছেলেটি যেন মুহূর্তে দূরে চলে যায়, দিদিমণি বলে,

'অমিত, সেই কবিতাটা শোনাও তো।'

'উঁ', আবার সেই দূরে জলে ডোবা স্বর ও ঘুঙুরের শব্দ। দূর থেকে হারিয়ে যাওয়া গরু ফিরে আসার সময়, যেমন তার গলায় ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়, তেমন। অমিত একটু প্রায় পিছনের দিকে হেলে দাঁড়ায়, তারপর আরো ধীর, জলে ডোবা স্বরে বলতে থাকে,

'এসেছে শরৎ হিমের পরশ'

'অত আস্তে না,' দিদিমণি বলে। তখন আরও আস্তে হয়ে যায়। অবিরল লালা ঝরে পড়ে। অমিত টলতে থাকে। চারপাশে দশ-বিশজন বাচ্চার অঙ্গ-ভঙ্গী, মুখের ঝোল, চোখ উল্টানো, ডিগবাজি খাওয়া, গানের মতো জড়ানো কিছুর জান্তব ধ্বনি উঠতে থাকে। অমিত এবার একটু স্থির হয়ে, মাথা কাৎ করে গায়, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে··· ।' 'সকল অহংকার হে' বলার সাথে সাথে হেঁচকি ওঠে, তারপর গলা একেবারে ডুবে যায়, 'ডুবাও চক্ষের জলে।' আয়া দৌড়ে এসে তোয়ালে দিয়ে লালা মুছিয়ে দেয়, 'আর না, থাক, দেখলেন তো'। হ্যাঁ, দেখলামই বটে। শুনে যে ভালোবাসা এমন অন্ধের মতো ধাবিত হয়, দেখার জায়গাতেই ধাক্কা খেয়ে সেই আকুল জলরাশি রুদ্ধ আক্রোশে ফিরে আসে। দিদিমণি যখন ট্রেন চলার শব্দময় দৃশ্য নেচে ও গেয়ে দেখায় তখন বাচ্চারা উথলে উঠে এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাদের আনন্দের দিকে ধাবিত হতে গিয়েও পারি না। যোগী প্যাঙ্গেলের ক্যামেরা আবার অন্ধের হস্তীদর্শনের উদ্দেশ্যে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে অ্যাঙ্গেল, পজিশন ঠিক করে; 'ক্লিক' করে শব্দ ওঠে। এর মধ্যে ট্রেনের ছবি গেছে। ক্যামেরায় আটকে পড়েছে দিদিমণি এবং স্যাম্পল প্রতিবন্ধী বাচ্চারা। ফিরে আসছি, বিকাশ কেন্দ্রের সিঁড়িতে অমিতের মা, একটু ম্রিয়মান, একটু উৎসুক গলা,'যাবেন বাড়িতে ?'

'যাব, অমিত কখন বাড়ি ফিরবে ?'

'আজ ভিক্টোরিয়ার মাঠে খেলার প্র্যাকটিস আছে।'

'এমন হল কী করে ?'

'আসুন না, বলবখন।'

যোগী গর্ভাবস্থার কতগুলো ছবি এঁকেছে। প্রাইভেট সেক্রেটারী রঞ্জিনীর আবার চিবোনো গলা,

'অ্যাকচুয়ালি মায়েদের কনসিভ করার সময়টা সম্পর্কে তোমাকে আরও ইন্টারভিউ নিতে হবে। কোন ফিজিকাল বা মেণ্টাল টর্চার হলে, কী কী ব্যবস্থা নেয়……'
এই রে, যোগীর পার্সোনাল সেক্রেটারিও কি ফেমিনিস্ট নাকি! এরপর বলবে, কতদূর অত্যাচার এবং ডিভোর্স। অতদূর অভিজাত নই। এখন বাচ্চাটিকে আমাদের পাশাপাশি এক সন্ধানের, সুখ-দুঃখের শরিক বলে ভাবতে পারি কিনা, কিংবা সে কোন জগৎ পেলে স্বাভাবিকভাবে তার নিজের মতো করে বাঁচতে পারে, তার উৎসগুলি, তার সংকেতগুলি খুঁজতে চাই। যোগী পাবলিকেশন কস্ট বার করতে এবং কমার্শিয়াল আর্টিস্ট খুঁজতে ব্যস্ত। গর্ভাবস্থার ছবিগুলির ওপর স্টাইলিস্ট সেক্রেটারির রঙ ছোপানো নখ বোলানো দেখতে ভাল লাগছে না। আমি এখনই এখান থেকে বেরোতে চাই। আজ আকাশটা কেমন? আজ শুধু আকাশ দেখা—ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে আসি। যোগীদের সিঁড়ি এত শ্বাসবন্ধ, কিন্তু ঝকঝকে পরিষ্কার। আমি আকাশের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সিঁড়ি শেষ হয়ে যায়। আর মনে পড়ে যায়, কাল রবিরার।

প্রাকৃতিক পরিচর্যার চেয়ে মানসিক প্রতিবন্ধীদের বাঁচাতে মেণ্টাল থেরাপি, টেগরিটাল টুহানড্রেট, লুমি নেলেট্ দিয়ে, অন্ধের রাত্রিদিনের মতো এদেরও রাতদিন সমান করে দেওয়া হয়। দিনের আলোর সজীবতা, আর রাতের নিবিড়তার স্পর্শ নেই। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনও আজ আর মুক্ত নেই, যে, এরা সেখানে প্রাণ ফিরে পাবে। শান্তিনিকেতন আজ প্রধান-মন্ত্রীর সার্টিফিকেট ধন্য, রাজনীতিপালিত। সেখানে শৈশব নেই, আনন্দ নেই। শ্রীনিকেতনে বীরভূমের লোককারিগর নেই। যেখানে হয়ত এসব বাচ্চারা প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে বেঁচে যেতে পারত। অন্তত প্রতিবন্ধী নামক আর এক নতুন হরিজন শ্রেণীর ভাষা পরিচয়ের লজ্জা বহন করতে হত না। বাগবাজার, বস্তিতে এগারো বছরের গোঙা সুবল আমার আঁচল টেনে কী যে বলত, তার মর্ম আজও আমি খুঁজে পাইনি। যদিও তীব্রভাবে তার অকথিত মুখ আমার মনে পড়ে।

অনেক ঘরের উঠোনওয়ালা এক বাড়ি। অন্ধকার। মহাত্মা গান্ধী রোডের বাঁদিকে, কলেজ স্ট্রিট ক্রসিং পেরিয়ে খুব পুরনো বাড়ি। ঠাণ্ডা। দোতলায় অনেক ঘর পেরিয়ে অমিত ও তার মাকে ফিরে পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকেই এক অনাস্বাদিত শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীরে। খাটের ওপরে নক্সা করা কাঁথায় শুয়ে আছে তুলতুলে গালফোলা ছোট্ট একটা বাচ্চা। অমিত ঝুঁকে পড়ে তার

অসম্ভব ছোট্ট একটা পায়ে হাত দিয়ে বসে আছে। চোখ বোজা, মুখে স্বপ্নে পাওয়া হাসি। আমি অনেকটা সময় কথা বলতে পারিনি। ওর মা নীরবতা ভেঙে কথা বলে, 'অমিত ওর ছোট্ট বোনকে নিয়েই থাকে এখন।'.....

'সব সময় ?'

'না, হঠাৎ করে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে তবলা বাজায়।'

'অন্য বাচ্চাদের কি ভালোবাসে ?'

'সেটাও ওর খেয়াল। তবে বাচ্চারা ওকে খুব ভালবাসতে চায়।'

'অমিত আমাদের কথার ফাঁকে গাইতে থাকে,

'নীল আকাশে কে ভাসাল...'। অমিতের গলায় সেই ছোট্ট ঘুঙুর, আর পাশের টেবিলল্যাম্পের আলো-ছায়ায় ছোট্ট বাচ্চাটার লাল পা দুটোর দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে ফেলি,

'অমিতকে একদিন বেড়াতে নিয়ে যাব।' ওর মা চমকে তাকায়। ভীষণ অবাক হয়ে গেছে মনে হয়। আমি সামলে নিই।

'না, মানে ওর বাইরে যাওয়া দরকার। এমন করে গান শিখল কোথা থেকে ?'

'অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছে। কিছুই ভোলে না। বাসে গেলেও, মুখ বাড়িয়ে আকাশ দেখতে দেখতে যায়। গান, ও নিজেই শেখে। যে সুর ওর ভাল লাগে, সে শুনেই শিখে নেয়', বলে অমিতের মা থেমে যায়।

'অমিতের বাবা' বলে পরিচয় করায়। সাদামাটা ভদ্রলোক ঢুকলেন,

'আপনি কি কোন কাগজ থেকে এসেছেন ?'

'না, না, আমি ছোট্ট একটা কাজ করছি।' অমিতের বাবা একটু দমে গেলেন মনে হয়। হায়! অমিতরা খবরের কাগজের পাবলিসিটি মাধ্যম হোক, তার বাবারাই চায়। ভদ্রলোক অমিতের জন্মের আগের ও পরের ডাক্তার, ওষুধের একটা লম্বা ইতিহাস দিলেন। এমন কি গর্ভাবস্থায় অমিতের মায়ের গর্ভে জল জমে গিয়েছিল, তার খবর দিতে আমি চেয়ে দেখি অমিতের মায়ের মুখ শুকিয়ে গেছে, মাথা নীচু করে রয়েছেন। আমি প্রায় তাড়া খাওয়া স্বরে বলে উঠি, 'না, না, এসবের আর প্রয়োজন নেই। সামনে কী করবেন বলুন।' ভদ্রলোক প্রায় হারার মুখে বলে ওঠেন,

'যা হবার তা হবে', এরকম প্রশ্ন করে লাভ কী ?' সত্যিই তো প্রশ্ন করে লাভ কী ? সত্যিই অমিতের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল ? সবটাই প্রশ্ন, সবটাই তিমিরে। উঠে আসছি, দেখি বাচ্চাটাকে পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে অমিত হাসাবার

চেষ্টা করছে আর আপনমনে গুনগুন করে কথা বলে যাচ্ছে। অজস্রধারায় লালা ঝরে পড়ছে। কসবার অনিন্দিতা হয়ত ভবিষ্যতে কী ভাবে বাঁচতে হবে, তার একটা সূত্র খুঁজতে আসতে পারে অমিতের কাছে, যদি অনিন্দিতাকে অমিতের কাছে পৌঁছতে দেওয়া হয় !

প্রবল বর্ষায় ডোবা গ্রাম নয়ায় রাতে পৌঁছই। দুখুশ্যাম চিত্রকরের গ্রাম। দুখুশ্যামের আঁকা পট, যা দেখে প্রায় সমগ্র প্রকৃতিনাট উঠে আসে চোখের সামনে। দুখুশ্যাম শুধু চিত্রকর নয়, দুখুশ্যাম একজন মানুষ, একথা আমরা কখনও ভাবি না। যা আঁকতে চায় না, শহরে এসে তাই তাকে আঁকতে হয়েছে। বাঁচার জন্য পুরাণপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাকে আনবিক যুদ্ধের ওপর আঁকতে হয়েছে। বধূহত্যা ও পণপ্রথা নিয়ে পট আঁকতে হয়েছে। অর্থাৎ শহরের হঠাৎ উঠতি আধুনিক বিত্তবানদের, উঠতি নারী-আন্দোলনকারীদের অর্ডার অনুযায়ী তাকে এঁকে দিতে হয়েছে। জ্যোতি, পুলিন, যমুনা, সব চিত্রকরদেরই আজ বাঁচার জন্য পট ছেড়ে চাষের শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে হচ্ছে। গ্রামের, দেশের রাজনৈতিক চরিত্রকে বুঝতে হচ্ছে। গ্রাম থেকে যেসব মানুষ শহরে চলে আসছে পুকুর, গাছ, নদী, ভিটেমাটি ছেড়ে তাদের যন্ত্রণা দুখুশ্যামের পটের গানে জ্যান্ত, 'যেমন, ছেলের কাছে মায়ের যন্ত্রণা'। দুখুশ্যামের কাছে তার জন্মভূমি এই,

'বৃক্ষ, পুকুর, জায়গা, জমি
এই নিয়ে জন্মভূমি'।

দুখুশ্যাম বোধহয় তার আত্মঅবমাননা ভুলতে ছেলেকে চেয়েছে পটের পৃথিবীতে। তার ছেলে মণ্টু, যার বয়েস বারো, সে এখন পট আঁকে। ছেলেকে দুখুশ্যাম শহরে আনে না। রঙ, তুলি, কাগজ যোগায়। মণ্টুর আঁকা সাঁওতাল পটে সাঁওতাল জন্মের আদিকাহিনী—আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, এতটুকু ছেলে কী করে এঁকেছে এই জগতের ছবি, ঘন জটিল রহস্যময় প্রাণগুলি। মণ্টুর পটে গোদার ছিপ নিয়ে মাছ ধরার ছবি যেন আড়ালে এই শহরকেই ব্যঙ্গ করেছে। গোদার মুখ, যা এই শহরের অসহায়তা, চালাকিকে প্রকাশ করেছে। সেই বর্ষার রাতে ভিজে কাঁথা থেকে উঠে, বাচ্চাদের জাগিয়ে মণ্টুর মা কুপি জেলে আমাদের জন্য ভিজে কাঠে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ রেঁধেছিল। মাঠের কলাপাতা কেটে এনে খেতে দিয়েছিল। ঘরের ভিতর থেকে মাথা বাড়িয়ে,

'আপনাদের খাওয়া হলনি ?'

আমার জন্ম গ্রামে। আমাকেও কি মণ্টুর মা শহরের বলে ঠাওরাল। হয়ত তার পক্ষে স্বাভাবিক। বর্ষায় ডোবা গ্রামে এসে, বেশিরাতে শিশুদের ঘুম কেড়ে নিয়ে, শেষ কেরোসিনটুকু পুড়িয়ে যদি শিল্পী দুখুশ্যামের বউকে শহরের মানুষের আপ্যায়ন, ভোজন করাতে হয়, তাহলে আমি ও আমরা অতিথি। আমার অপরিচয়, আমার প্রতিবন্ধকতা ঘুচাবে কে? মনে মনে প্রশ্ন করি। দুখুশ্যামের কাছে গ্রাম ছাড়া মানে জন্মভূমি ছাড়া, এ দুঃখ আমারও। তবু, যারা শহরে থেকে গেছে তারাও একদিন গ্রাম ছেড়েছে। দুখুশ্যাম, পুলিন-জ্যোতি-মণ্টুর মধ্যে সেই আকাশ, সেই মাটির স্পন্দন রেখে যেতে চায়, যা কেনা বেচা করা যায় না। সব কিছু হারিয়েও।

খোলা জিপ পৌঁছয় মেদিনীপুর স্টেশনে। দুখুশ্যাম আমাদের সঙ্গী। স্টেশন থেকে একটু দূরে একটা মাঠে একদল ইরানীর তাঁবু। খবর আগেই পেয়েছিলাম। বেদের তাঁবু, ঠিকে মজুরদের তাঁবু দেখেছি। খোলা মাঠে চারদিকে খড় বিছানো, দড়ি দিয়ে তাঁবুগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে, খুঁটিতে বাঁধা। একটা লাল রেশমী সুতোগোছায় জড়ানো বেণীর প্রান্ত তাঁবুর বাইরে দেখা গেল।

আমাদের জুতোর শব্দে ঝটিতি বেণী নড়েচড়ে উঠল এবং বেরিয়ে এল এক কিশোরী। বইতে পড়া ইরানী কিশোরী নয়। একেবারে জলজ্যান্ত। সুর্মায় আঁকা চোখ বাঁকা বিদ্যুৎ রেখার মতো। তীক্ষ্ণ নাক। ঘাঘরা। জরিজড়ানো তামাটে ঘন চুলের লম্বা বেণী দুলছে। আবার তাঁবুর ভেতর অদৃশ্য হল। একটু দূর থেকে ঘন তামাটে পোড়া গায়ের রঙ, কাটা কাটা অথচ ভরাট লাবণ্যময় চেহারার এক বৃদ্ধ এগিয়ে আসছেন। চোখের দৃষ্টি তীব্র উজ্জ্বল অথচ শান্ত। আমাদের পথপ্রদর্শক দীপকদা বলে ওঠেন,

'আপনাদের খোঁজে এলাম।' আবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, একটা ধার খেলে গিয়ে শান্ত হল,

'আমাদের খোঁজ? আমরা দশ বছর এই স্টেশন চত্বরেই আছি।' বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়। আমাদের কেউ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি না। 'খোঁজ' শব্দে যেন ইরানী মানুষটির তীব্র ক্ষোভ আর যন্ত্রণা ঝরে পড়ল। এমনভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি হব, ভাবতে পারিনি।

সঈদা বেগমের মায়ের গলা এমনই শুনেছি। আমাদের পথপ্রদর্শক বলে ওঠেন,

'না জানতে চাই, দেশে ফিরতে চান কি না।'

প্রায় রূপকথার মতো যুবা, কিশোর, যুবতীরা এসে জমে গেছে। ইরানী বৃদ্ধ হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ অথচ প্রায় শান্ত আজ্ঞাস্বরে বললেন,

'তুম তো ক্লান্ত। ব্যয়ঠ্‌ যাও বেটি।' কথার মধ্যে কী যে ছিল আমি বলতে পারব না। হঠাৎ যেন সব ক্লান্তি অনেকখানি দূরত্ব দূর হয়ে গেল। বেটি বলার মধ্যে এমন মাধুর্য, এমন আদেশ ছিল—আমি তৎক্ষণাৎই মাটিতে বসে পড়লাম। ততক্ষণ আশপাশ কথায়, হাসির একটা উষ্ণ লাবণ্যে ভরে উঠেছে। আমাদের দীপকদা তাঁর মানুষকে আপন করার একটা অকপট অথচ রহস্যময় ছন্দে কথা বলতে শুরু করেছেন, 'আমিও একবার ইরান গিয়েছি। আমার বন্ধুরাও আছে, ইরানী বৃদ্ধের মুখ আরও জ্যান্ত, বেদনার্ত, 'আর পারি না, দেশে ফিরতে চাই, আমাদের দেশে'

'কেন, এখানে কি ভাল লাগছে না ?'

'না', তা নয়, চল্লিশ বছর এই দেশে ঘুরছি। এই দেশের মানুষ ভাল। বাংলার মানুষ অতিথিকে ভালবাসে—তবু·····'

চেয়ে দেখি, তামাটে কালো চোখের মণি ঝটপট করে ঝাপট দিয়ে একটু টলে গেল। উপচে উঠতে চেয়েও শান্ত হল।

'তবু কী ? ইরানে তো রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ···'

কথাটার সুতো ছেড়ে দেন দীপকদা।

'—তবু দেশেই ফিরতে চাই। আমার এই সত্তর বছর বয়স। তিরিশ বছর বয়সে দেশ ছেড়েছিলাম। দাঙ্গা হোক, খুন হোক, তবু ইরান আমার জন্মভূমি···'

আবার চোখ ঝটপটায়। তামাটে মুখ একটা অসম্ভব যন্ত্রণায় একবার কুঁকড়ে গেল। রাজা এবং দেশান্তরী দরবেশ যেমন হয়। পথে পথে ঘুরেও তার পিপাসার জল সেই সুদূর স্বদেশের মাটিতে।

'কী করে ফিরবেন, ভেবেছেন ?'

'এদেশের প্রশাসনের তো মর্জি। কতবার দিল্লীতে আবেদন করেছি। 'হবে, যাওয়ার ব্যবস্থা হবে' বলেও শেষ অব্দি যাওয়ার ব্যবস্থা হয়নি। আপনি তো বহু জানেন, আপনি আমাদের জন্য একটু দেখুন না।' 'আমিও প্রায় ঠিকানাহীন। আমার কথা প্রশাসন শুনবে কি ?' দীপকদার কথায় বৃদ্ধ একবার মুখ তুলে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যান।

'—সবাই আজ দেশ ছাড়া, ঘর ছাড়া। যাদের দেখছেন, তাদের সবাই দেশে ফিরতে চায়। আমি তো সবচেয়ে প্রাচীন, প্রায় এদের সবার, ওই আপনাদের ভাষায় 'ঠাকুর্দা'

—বলে বৃদ্ধ সবার দিকে ঘন স্নিগ্ধতায়, ভালবাসায় দৃষ্টি বুলিয়ে যান। একটু স্মিত হাসি ততক্ষণে দেখা দিয়েছে। অনেক সমাধানহীন প্রশ্ন নিয়ে আমাদের

ফিরতে হয়েছিল। এই দেশান্তরী দল তাঁবু ফেলেও ঘর বাঁধতে পারেনি মানুষের মধ্যে থেকে অপরিচিত ছিন্নমূলের দলে—প্রান্তবেদনার বিচ্ছিন্নতা ও সাযুজ্য সেখানেই। জানি না, এই তাঁবুর যুবা, কিশোরীরা এই পশ্চিমবাংলা, স্টেশনদেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় কিনা। কোন কিন্তু, কোন মায়ার টান কি নেই? দুখুশ্যামের পটের গান, দেশান্তরী হওয়ার অসহায়তা ও ভালবাসার যন্ত্রণা, 'যেমন ছেলের কাছে মায়ের যন্ত্রণা' বার বার ফিরে আসছে। দেখি আমাদের সঙ্গী দুখুশ্যাম চিত্রকরেরও মুখ বিষণ্ণ হয়েছে। ঘৃতাচী অপ্সরার বংশধর পটশিল্পীরা যুগে যুগে যাযাবর, জাতহীন, ধর্মহীন। হিন্দুও বটে, আবার মুসলমানও। কিন্তু কোথাও ঠাঁই পায় না, শুধু পটের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা ছাড়া। বেহুলা এই মৃত সভ্যতাকে নিয়ে দেশান্তরে ভেসে ভেসে চলেছে—কবে প্রাণ পাবে, আবার নতুন প্রাণ, নতুন ছন্দস্পন্দন বেজে উঠবে—এই আশায়। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের অঙ্কিত পোদ্দারের আঁকা ছবি বিকাশ কেন্দ্রের কাচের ঘরে। মানসিক প্রতিবন্ধী অঙ্কিতের মৃত্যু হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ কি ফুরিয়েছে? মানসিক প্রতিবন্ধীরা শুধু প্রতিবন্ধী বলেই কী বিকাশ কেন্দ্রে লালিত হবে? অঙ্কিতের ছবিগুলি কি বিকাশ কেন্দ্রের দেওয়ালের আড়ালেই থেকে যাবে?

আলি হোসেন। পূর্বাশা বস্তির আলি হোসেনকেও বাঁচানো যায়নি। সেই দশ-বারো বছরের ছেলেটি যে একটা খাতা পেনসিল নিয়ে রোজ নীরবে আমার পাশে এসে বসত, আর গল্প শুনত আর উঠে আসার সময় পিছু পিছু অন্ধকারের খুব ফিস্ ফিস্ করে বলত, 'আমারে একটু পড়া দেখান না, আমারে একটা গল্পে বই···।' রাস্তা পেরোতে গিয়ে গাড়ীর ধাক্কা খায়, বিশদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ালড়ি করে। বাঁচেনি। মাথার ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়। তখন তার বেডের পাশে রাত-দিন ঘুমহীন তার ন'মাসের গর্ভবতী মা। আলি মারা যাওয়ার পর কেমন শান্ত পাথর হয়ে গিয়েছিল। নতুন বাচ্চার জন্ম হলে বলত, 'আবার আমার আলি ফিরে এসেছে।' কিন্তু এখনও আলি হোসেনের সেই গাঢ় ফিস্ফিস্ অনুরোধ মাঝে মাঝে আমায় ওলট-পালট করে দেয়। মৃত্যুরও চূড়ান্ত প্রান্তদেশ আছে—যেখানে আলি হোসেনকে যুঝতে হয়েছিল—সেখানে আমার মনের সঙ্গেও আমি যুঝে যাচ্ছি।

পথে ঘাটে, ফুটপাতে, জঞ্জালের ভিতর মানুষের মৃত্যু বেড়েছে। কেউ গ্রাম থেকে শহরে বাঁচতে এসে মরেছে। লীলার ভিতর যেতে গিয়ে পথ হারিয়ে আর ফেরেনি। কোন রাতে কোন শহিদের, কোন মহাপুরুষের মাথা অন্ধকারে ভাঙা হয়ে অন্ধকার জগতে চলে গেলে—তার প্রান্তিক দর্শক পথমানুষেরা।

দিনের যে জীবনস্রোত ও লীলারহস্য—অন্ধত্ব ও দৃষ্টির যে ধারা বয়ে চলেছে, তার দ্রষ্টা প্রান্ত মানুষেরা। তাদের মাথা শহিদের নয়, তাদের মাথা মহাপুরুষেরও নয়। তাদের স্মৃতিজগৎ আছে, চোখ আছে। 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ' —তাদের পাশাপাশি তাদের থেকে দূরে—চেনা দেশে অচেনা মানুষেরা।

সেদিন মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে খুব পুরনো বাড়ির সিঁড়িতে যে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলাম, তা আমাকে মাঝে মাঝে জর্জরিত করে তোলে।

'কার ইণ্টারভিউ? অঙ্কিতের? সে দেড়বছর আগে মারা গেছে। জানেন না?'—প্রশ্ন অঙ্কিতের মায়ের। □

Space donated by :

Grewal Transport Co.

Space donated by :

Planters Airways Ltd.

Road and Air service all over India

Adm. Office :

10, Polock Street, Calcutta-700 001

Phone : 26-9028, 27-6895/6

Booking Office :

38, Kali Krishna Tagore Street,

Calcutta-70

Phone : 39-0784/5

Delivery Office :

67/28, Strand Road, Calcutta-700 006

Phone : 38-1161, 38-4681

সুবোধ দাশগুপ্ত

....

দাঙ্গা, নির্বাসিত জীবন ও মুখের মিছিল

১৯৪৫ সালের শেষে, মিত্রশক্তির সৈন্যরা যে যার ঘরে ফিরছে। আমরা তখন সবে ক্লাসের ফাইনাল দিয়েছি, অফুরন্ত অবসর। অন্তত মাসখানেকের জন্যে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, যার বাংলা তর্জমা এই রকম হতে পারে। 'আলসে মাথা, খুনীর কারখানা'। তখন অভিভাবকদের শিথিল শাসন। আমাদের অফুরন্ত আড্ডা আর মনে মনে কাল্পনিক যুদ্ধের মহড়া। 'দাঙ্গা'-র 'স্ট্র্যাটেজি' কথা।

আমাদের উত্তর কলকাতার দমদম অঞ্চল তখন মফঃস্বল। শ্যামবাজার গেলে তখন বলতাম 'কলকাতা'য় যাচ্ছি'। কলকাতার লোকদের দেখলে আমরা মফস্বলী হীনমন্যতায় ভুগতাম।

আমাদের অঞ্চলটা ছিল মুসলমান-প্রধান। আকাশে বাতাসে যখন তখন স্লোগান-যুদ্ধ। একদিকে 'বন্দেমাতরম্' অন্যদিকে 'আল্লা হো আকবর'। আমাদের গায়ে কাঁটা দিত। 'কী হয়' 'কী হয়' হাওয়া। সারাদিন উত্তেজনায় থাকা, রাতে পাহারা দেওয়া।

তখন বাবা মোটামুটি হিন্দু মহাসভার' সমর্থক। তার কারণ একটাই আমার বোধে আসে। সেটা হল, আনার পিতামহ স্যার আশুতোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত নেতা শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে সেই সূত্রে যোগাযোগ। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি বাবা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ সবই শোনা কথা। আমার কৈশোরে অনেকবার বাবাকে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখেছি।

একবার আমিও ভবানীপুরের বাসায় ওনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। নেহাৎই পারিবারিক কারণে। এখানে সে প্রসঙ্গ অবান্তর। এদিকে পাড়ায় যুদ্ধপূর্ব প্রস্তুতি চলছে। যে দিক থেকে যে পারছে অস্ত্র সংগ্রহ করে যাচ্ছে। আজকের আতঙ্কবাদীর কাছে 'প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র' সে গুলো। লাঠি, সোঁটা, গুপ্তি ইত্যাদি।

এই 'গুপ্তি' প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে।

বিকেলে আমরা চারপাঁচজন মাঠে বসে গভীর গুলতানিতে ব্যস্ত, এমন সময়, আমাদের এক বন্ধু, কানাই, হন্ত-দন্ত হয়ে এল। হাতে একটা সরু বাঁশের নল যার দুদিক আটকানো। ওপরে একটা টিনের মুখটি দেওয়া। হাতখানেক লম্বা হবে। ওটা দেখিয়ে কানাই বলল, 'এটা কী বলতো ?' আমরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখতে লাগলাম। ওই বাঁশের নলটা থেকে লম্বা চক্‌চকে শিক বের করল। যার মাথাটা ছুঁচোলো। কানাইয়ের 'ক্যালি' দেখে আমরা অভিভূত।

'—এই মোক্ষম অস্ত্রটা কোথায় পেলি ?' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম।

'—বলব কেন ?' বলে রহস্য ভাঙল, আরে, যাদের জন্যে এ অস্ত্র তৈরি তাদেরই একজনকে দিয়ে বানিয়েছি।

আমরা চোখ বড় বড় করে দেখছি।

'—আরে লুকু মিয়া রে, আমরা যাকে 'লুকু কামার' বলি। ও যে কী করেছে ও নিজেই জানে না।'

'যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া' আর কি !

আমরা বললাম, 'এ রকম কতগুনো ?'

'—সে তোদের ভাবতে হবে না।'

কানাইয়ের দৌলতে আমরা সবাই একটা করে পেয়েছিলাম। ওটা পেয়ে আমাদের আপাত সাহস বেড়েছিল বটে কিন্তু স্বস্তি ছিল না। ওটাকে বাড়িতে নিরাপদ স্থানে রাখাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে অভিভাবকদের

চোখ এড়িয়ে। অস্ত্রপ্রয়োগে অনভিজ্ঞতা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। নানা আতঙ্ক আর সত্যিমিথ্যে সংবাদ খবরের কাগজ, বেতার মারফতে আমাদের বিচলিত করছে। প্রায় রাতারাতি ঘরের দাও, কুড়োল, বঁটি শান দেওয়া চলছে। অনেক বর্শার ফলা, লাঠি সংগ্রহ চলছে আর সেই 'মোক্ষম অস্ত্র' কানাইয়ের দৌলতে সংগ্রহ হয়েছে ইতিমধ্যেই। প্রত্যেক বাড়ির ছাদে বস্তা বস্তা রাস্তার ইঁট-পাটকেল, পাথুরে খোয়া জড়ো করা চলছে। অভিভাবকদের মধ্যে যাঁরা এসব পছন্দ করতেন না শেষ পর্যন্ত সায় দিলেন। এদিকে দেখছি খোলা 'তরোয়াল' নিয়ে অচেনা মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর 'নাড়া' লাগাচ্ছে 'আল্লা-হো-আকবর'। আমরাও ছেড়ে কথা কইছি না। দল বেঁধে বেরিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে 'গুপ্তি' হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাড়ির মেয়েরা একসঙ্গে শাঁখ বাজিয়ে পরিবেশকে ভয়াবহ করে তুলছে। পরক্ষণে দেখি রাস্তা পরিষ্কার। ওরা পালানোর সময় আমাদের হাতের 'এক হাতি'টাকে সন্দেহের চোখে দেখতে দেখতে যেত। আমরা কখনও নল থেকে 'মোক্ষম অস্ত্র'টি বের করতাম না। কারণ তাতে কী বিপদ ডেকে আনে কে জানে ?

আমাদের পাড়া থেকে বড় রাস্তার মুখটাতে লুকু কামারের কামারশালা। একটা ঝুপড়ি ঘর। খোলার চালা। চালের ফুটো দিয়ে এখানে সেখানে সূর্যের আলো পড়ছে। ওখান থেকে বর্ষার জলও পড়ে। মাঝে মাঝে নিজেই সারিয়ে নেয়।

ঝুপড়ি ঘরে কাঠ কয়লার হাঁপরটানা উনুন, উত্তপ্ত লোহা ঠাণ্ডা করার জন্য উনুনের পাশে মাটিতে বসানো একটা গামলায় জল। গামলাটাও পোড়া মাটির। লুকু কামার লোহা পেটাই করে। পাশে একটা চাটাইয়ের মাচানে বসে কামারের 'বিবিজান' তামাক পাতা বেচে। অশিক্ষিত, গরিব কামার-পরিবারের মাথায় দাঙ্গার ঘোর-প্যাঁচ ঢোকে না। সামান্য পয়সার বিনিময়েই খুশি হয়ে কাজ করে দেয়। কেউ যদি তার উপর ওর কাজের প্রশংসা করে তো কথাই নেই।

কানাই ওর এই দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করেছিল। সরল সাদাসিধে, অশিক্ষিত লুকুর মাথায় কোন জটিলতা ছিল না। একমাথা শনের মতো কাঁচা-পাকা চুল। টিংটিঙে, কালো কুচকুচে রং। বিবিজানের চেহারা আরও এককাঠি সরেস। নীলচে ছেঁড়া-ফাটা তেনা গায়ে জড়ানো থাকত। ওই তেনার নীচে চামড়ায় ঢাকা কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

দুজনেই ছোট নলওয়ালা হুঁকো টানত। বিবি সারাদিন লুকুকে কাজের জোগান দিত আর চিটে গুড়মাখা তামাক, তামাকপাতা আর কাঠ কয়লা বেচত। ওদের কোন বাচ্চা কাচ্চা ছিল না। হাসি তার লেগেই থাকত। এ হেন মানুষ দুটো কার শত্রু হতে পারে? সন্দেহ করেনি কখনও কাউকে। ওর কোন কাজ যে ওরই মৃত্যুবাণ হতে পারে এ চিন্তার অবকাশ ছিল না লুকুর।

আমাদের প্রস্তুতির কোন ত্রুটি ছিল না। তবে আগবাড়িয়ে একটা খুনটুন করার মতো কোন বাসনা ছিল না। লুকুর মতো নিরীহ লোকটাকে সপরিবারে উৎখাত করা আমাদের কাছে কিছুই ছিল না, আমরা ওকে হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে কখনও ভাবতাম না। আমরাও যেমন সহজ চোখে দেখতাম, তেমনি

ও আমাদের দেখত। আমরা ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তিত ছিলাম। এর বছর কয়েক পরে ওদের এক বিষাদময় পরিণতি ঘটে।

এদ্দিকে সারা দেশে 'রণং দেহি' অবস্থা। সুবে বাংলার প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব। তখন 'মুখ্যমন্ত্রী' বলে কিছু ছিল না।

সুরাবর্দি সাহেব তখন মুসলিম লিগের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। হিন্দু-বিদ্বেষী বক্তৃতায় মুসলমানদের উত্তেজিত করে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য 'পাকিস্তান' হলেই তোমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে। মুশকিল আসান কতটা হয়েছিল জানা নেই।

মুসলিম লিগ 'কাফেরদের জব্দ করার জন্যে আনসার বাহিনী তৈরি করেছে। সবুজ কোর্তা পায়জামা পরা জঙ্গী বাহিনী সরকারি মদতে পাড়ায় পাড়ায় মার্চ করে আতঙ্ক ছড়িয়ে চলেছে।

এই রকম কোন দাঙ্গাজনিত আতঙ্ক ছড়ালেই পুরোন কিছু প্রভাবশালী স্থানীয় লোক পাড়ায় এসে হিন্দুদের নির্ভয়ে থাকতে উপদেশ দিতেন। আমরা থাকতে আপনাদের গায়ে কেউ আঁচড় দেবে না।

আপনারা ধৈর্য্য ধরে, শান্ত হয়ে থাকুন। এদের মধ্যে দুজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। একজন ছন্নু মিয়া, যার একটা বিড়ি সিগারেটের দোকান ছিল। দোকানটি খুবই চলে। অনেক লোকজন ঐ দোকানে বিড়ি বাঁধার কাজ করত।

বাবা শেষের দিকে খুব বিড়ি খেতেন। পয়সা দিয়ে বলতেন, 'যা ছন্নুর দোকান থেকে বিড়ি নিয়ে আয়।' আমাদের সঙ্গে খুব জান-পহেচান ছিল।

'—হাঁ বেটা, বাবুকা হাল ক্যায়সা হায় ?' আমাকে 'বেটা' বলতেন। বাবার তবিয়তের খারাপ হালের খবর রাখতেন। আমাদের বাড়ির সামনে একটা খোলা বারান্দা ছিল। তার সামনে রাস্তা পেরোলেই বেশ প্রশস্ত পুকুর। গরমকালে ওই বারান্দায় বসে থাকতে ভালই লাগত। অফিস ফেরত বয়স্করা এসে বসতেন। পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছার আদান-প্রদানের পর পারিবারিক সমাচার ও সমকালীন রাজনীতি, অফিস, বাজার দর ছিল আলোচনায় বিষয়বস্ত। মাঝে মাঝে তাসের আড্ডা বসত। মুড়ি আর চায়ের জোগানদারির কাজ ছিল মায়ের।

এই আড্ডায় ছন্নু মিয়া, মোক্তার হোসেনের মতো লোকও মাঝে মাঝে আসত। তার জন্য জাতপাতের তফাত বুঝতাম না। তফাতের মধ্যে এরা কেউই বাঙালি মুসলমান না।

মোক্তার হোসেন ছিলেন মিউনিসিপাল কমিশনার। মোটামুটি শিক্ষিত। ওঁর কাছে কেউ পৌর সংক্রান্ত নালিশ নিয়ে গেলে মুসলমান হিন্দু নির্বিশেষে সাহায্য করতেন। ওঁর একটা ইলেকট্রিকের দোকান ছিল। আমরা ওঁকে 'চাচা' বলতাম। ওঁর ছেলেটা আমাদের চেয়ে এক-দু ক্লাস নীচে পড়ত। আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেলাধুলো করত।

আমাদের ঘনিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান বন্ধুরা কেউ 'নাড়া' দিত না বা 'খোলা তরোয়াল' নিয়ে আস্ফালনও করত না।

তবু নানা সূত্র থেকে এলোপাথারি সংবাদে বিচলিত হয়ে যেতাম।

পরস্পরকে সন্দেহের সূত্রপাত সেই থেকে। আমাদের মধ্যে পাকাপাকি পাঁচিল উঠে গেল। আজও আমরা সে পাঁচিল ভাঙতে পারলাম না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন কালোবাজারি, মাফিয়া ও দুর্ভিক্ষের জন্মদাতা তেমনি দাঙ্গার 'নেট রেজাল্ট' জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস, শূন্যতা ও মানবিকতার হত্যা।

আমাদের অঞ্চলে দাঙ্গার উত্তেজনা দুই তরফেই ছিল। তবে কাউকে খুন হতে দিই নি। অস্ত্রসজ্জা ছিল নেহাতই আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। আমাদের ওই বয়সে অ্যাডভেঞ্চারের প্রবৃত্তি ছিল রক্তে, খুনের রক্ত কোন দিনই প্রবাহিত হয়নি ধমনীতে। এর কারণ আমাদের পরিমণ্ডল, শিক্ষা, গুরুজনদের আচরণ। সর্বোপরি কেরানিনন্দনের খুন করার বুকের পাটা থাকে না। ইংরাজ আমলে আমাদের 'কেরানিবাবু' বলে পরিচিতি ছিল।

আমার পৈত্রিক দেশ ছিল যশোরে। কবে আমরা দেশ ছেড়েছিলাম জানি না। অন্ততঃ বাবার কাছ থেকে কিছু শুনিনি। আমাদের চারপুরুষ কলকাতায় বসবাস।

শৈশব কেটেছে কালীঘাটে, দমদমে। তার আগে চেতলায়। ওখানকার কথা মনে নেই। হয়ত পৃথিবীর আলো তখনও দেখিনি বা দেখলেও স্মৃতিতে থাকার কথা নয়। ১৯৩৪ সালে দমদম আসি। সেই থেকেই আমাদের পারিবারিক বসবাস এখানেই।

তখন কাগজ ও বেতার মারফতে খুনোখুনির খবর আসছে। কলকাতার গলিতে গলিতে উত্তেজনা। নোয়াখালির মৃত্যু যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেছে। গান্ধীজী স্বয়ং দাঙ্গা থামাতে দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত। সেই সময় কলকাতায়ও আগুন। জ্বলছে কলাবাগান, রাজাবাজার, বেলেঘাটা, খিদিরপুর, পার্কসার্কাস।

আশ্চর্যের কথা, বস্তি এলাকায় দাঙ্গার প্রবণতা দেখা গেল বেশি। বীভৎস ছবি, বর্ণনা খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বেরুচ্ছে। একএকটা খবর পড়ি বা শুনি, আমরা শিহরিত হই। এরপর বিহারের দাঙ্গা সব খবর স্তব্ধ করে দেয়।

১৯৪৬ সালের ১৪ই আগস্ট রাত বারোটায় তোপধ্বনি শোনা গেল। নেতাদের ভাবগম্ভীর বক্তৃতা। জনসাধারণকে সজাগ করে দেওয়া হল তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে। কেন দেশ ভাগ হল তার সাফাই গাওয়া হল।

এদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের কোণে-কোণে। কলকাতার সৎ নাগরিকেরা মিলে 'শান্তি কমিটি' গঠন করলেন। এরা উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে শান্তির বাণী ছড়ালেন। কোথাও কোথাও সামান্য কাজ হল।

একদিন কাগজে বেরুল স্বাধীনতা সংগ্রামী ও একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী 'সুশীল দাশগুপ্ত' মহাশয় আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন। তখন তিনি 'শান্তি মিছিল'-এর পুরোভাগে ছিলেন। সেদিনই সরাসরি আগুনের আঁচ অনুভব করলাম। সুশীলবাবু আমাদের নিকট আত্মীয় ছিলেন। ছোটবেলায় বার দুই ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। চেহারাটা চেনা ছিল।

ছোটবেলা থেকেই সিনেমা দেখার একটা প্রবণতা ছিল। বিশেষ করে হলিউডের ছবি। হলিউডের ছবিই বেশি আসত। ভাল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাসের চিত্ররূপ হলে তো কথাই নেই। সেই সুবাদে অনেক ভাল ছবি দেখে ফেলেছি। একবার আগে থেকে না জেনে একটা হলে ঢুকে পড়ি।

খুব বোকা বনে গিয়েছিলাম। সে ছবির বিষয় ছিল একজন আমেরিকান 'কাউবয়'কে নিয়ে। যে বার রোনাল্ড রেগন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হলেন আমি নাক সিঁটকিয়েছিলাম। সেই নৃশংস কাউবয়টিকেই শেষপর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট করা হল!

সিনেমা দেখার একটা রোমহর্ষক কাহিনী—

তখন ক্লাশ নাইন-টেনে আমাদের র‍্যাপিড রিডার ছিল চার্লস ডিকেন্সের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর স্কুল সংস্করণ। বইটা পড়তে গিয়ে একটা নতুন শব্দ শিখেছিলাম, শব্দটা ছিল 'পস্থুমাস'।

'হোয়েন আই ওয়াজ বর্ন, মাই ফাদার ডায়েড। আই ওয়াজ এ পস্থুমাস চাইল্ড।'

বইয়ের আরম্ভেই এই রকম একটা বর্ণনা ছিল। প্রথম যখন ক্লাশ টিচার শব্দটির মানে বলে দেন তখন সহানুভূতির সমস্তটাই ঐ 'ডেভিড'-এর ওপর পড়ল।

আহা, বেচারা বাবাকে দেখতে পেল না। সৎবাবাকে পছন্দ না হওয়ায় মা 'আন্টি' অর্থাৎ পিসির কাছে রেখে এলেন। সারা জীবন ডেভিড কত কষ্ট পেল। কাঠ-খোট্টা পিসির কাছেই মানুষ হতে হল।

সেদিন অন্যান্য দিনের মতো কাগজ দেখতে গিয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপনের পাতায় দেখি 'ছায়া'সিনেমায় 'ডেভিড কপারফিল্ড' হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, যেমন করেই হোক, আজই দেখতে হবে। সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়িতে বলে গেলাম, বেরুচ্ছি। আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে। শুনে মা আপত্তি করলেন। অনেক অনুনয়ের পর বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার কথা বলাতেই বরফ গলল। আমি 'মুক্ত বিহঙ্গ' হয়ে দুপুর বারোটা নাগাদ রওনা দিলাম। তখন কলকাতায় দাঙ্গার গরম হাওয়া তুঙ্গে। দমদমে সেটা আঁচ করা যায় নি। সঙ্গে কাউকে না নিয়েই 'যা হয় হবে' বলে রওনা দিলাম। শ্যামবাজার নেমে ভয় ভয় করতে লাগল। মানিকতলা পর্যন্ত 'যাব কি যাব না' দোটানায়। ভাবতে ভাবতে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে বিবেকানন্দ রোডের দিকে হাঁটতে লাগলাম। স্বাভাবিকের চেয়ে কম লোক চলাফেরা করছে। সবারই মুখে একটা আবছা আতঙ্কের ছাপ। আমিও দুদিক দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। বিবেকানন্দ রোডের কাছাকাছি পৌঁছতে একদঙ্গল আর্মড পুলিশের মধ্যে থেকে একজন পাহারাদার বলে উঠল 'কাঁহা যাওগে ?' 'যেখানে বাঘের ভয়— ।' আমার সেদিন প্রথম স্টেজে ওঠার অবস্থা। হাঁটু দুটো শাসনে নেই। আমি খেই না পেয়ে সামনের একটা গলি দেখিয়ে দিলাম। পুলিশটা আর কিছু বলল না। বিবেকানন্দ রোড দিয়ে মানিকতলার কাছাকাছি যেতে আর এক বিপদ। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক আমায় ডেকে বললেন, 'খোকা কোথায় যাচ্ছ ? রাস্তার ওপারে যেও না, বাগমারিতে চারজন খুন হয়েছে। এই সময়ে বাড়ি থেকে না বেরুলেই হত না ?' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা মিলিটারী ট্রাক হুস্ করে বেরিয়ে গেল। তার ছাদ খোলা। পাঁচ-ছজন মিলিটারী, রাইফেল, টমি গান চারিদিকে তাক করা। 'পান থেকে চুন খসার' উপায় নেই।

বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। তবু এ ফুটপাথে অল্প লোকজন আছে। সাহস করে গুটি গুটি পায়ে 'ছায়া' সিনেমার গেটের কাছে গিয়ে দেখি এক ভোজপুরি দারোয়ান টুলের ওপর বসে। হাতে একটা লাঠি তবে আকারে ছোট। আমি এগিয়ে গিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ শো বন্ধ ?' যেন চোরাই মাল পাচারের সংবাদ নিচ্ছি। কেউ শুনে ফেলল না তো ? চারিদিক দেখে নিলাম।

দারোয়ান আমার অবস্থা দেখে হেসে গেট একটু খুলে ভেতরে ঢুকতে বলল। আমার মনে হল যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে জেলখানার বাইরে, না ভেতরে ঢুকলাম। তবে গেটের ভেতরে ঢুকে স্বস্তি পেয়েছিলাম, এটা মনে আছে। প্রদর্শনী চত্বর একটু ভেতরে। আমার কাছাকাছি বয়সের কয়েকজন ছেলে, মনে হল নিকটস্থ কোন লোকালয় থেকে এসেছে। তাদের মুখে চোখে কোন উদ্বেগ নেই। তারা পরিবেশের সঙ্গে ধাতস্ত হয়ে যাওয়া বলেই মনে হল। হলের ভেতরে ঢুকে নিজের পছন্দমত সিটে বসে পড়লাম। সাড়ে চার আনার টিকিটটি লাইটম্যানদের কাছে দেখাতে একজন বলল, 'আজ যেখানে খুশি বসে পড়।'

হলের মধ্যে সর্বসাকুল্যে দশ থেকে বারোজন দর্শক। আমার প্রথমটায় গা ছম্‌ছম্‌ করছিল। ছবি আরম্ভ হতে সেই অবস্থা কেটে গেল। আড়াই ঘণ্টা 'ডেভিড'-এর জগতে ডুবে গেলাম। আমি তখন প্রায় 'ডেভিড', ইংল্যাণ্ডের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, কলকাতার কোন দুশ্চিন্তা নেই।

ছবি যখন শেষ হল প্রায় ছটা বাজে, গরমকাল দিনের আলো তখনও আছে। বেরিয়ে কোন দিক না তাকিয়ে 'ছায়া' সিনেমার দক্ষিণের একটা গলি দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। গলির মুখটায় আজকের পেট্রল পাম্প তখনও তৈরি হয়নি। মতলব, সদর রাস্তার গা ছম্‌ছম্‌ করা আবহাওয়া এড়ানো। মনে মনে ম্যাপ এঁকে নিয়েছিলাম, সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে তারপর উত্তরমুখো প্রথম গলি ধরে শ্যামবাজার মুখো হাঁটা দেব। গলির ভেতর বেশ খানিকটা বস্তি অঞ্চল। সেখানে বাচ্চারা ঘরের দাওয়া, রাস্তায় খেলাধুলা করছে। বউ, ঝি, ব্যাটাছেলেরা কাজকর্ম করছে। তবু প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে।

বস্তি থেকে তথাকথিত ভদ্র পাড়ায় পৌঁছতে উত্তরমুখো কোন গলি পাই না। ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছে। হাঁটা আর থামে না। তখন কলকাতার গলিতে গ্যাস পোস্টে আলো জ্বলে। কোথায় আমার বাঞ্ছিত গলি। গলি আর পাই না। 'নিজের ছায়া দেখে ভয় পাওয়ার পরিবেশ। গ্যাস পোস্টের নীলচে আলোর সেই আলো-আঁধারির রোমান্স হারিয়ে গিয়ে এক ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে। জনপ্রাণী বলতে রাস্তার কুকুর ছাড়া একটা বেড়ালেরও দেখা মিলছে না। একটা বাঁকে এসে তারস্বরে কুকুরের ডাক শুনে থমকে দাঁড়াতেই দেখি, একটু দূরে একটা গ্যাস পোস্ট। তার টিমটিমে আলোয় ছায়ার মতো কুকুরগুলো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আর এদিক ওদিক ছুটছে। আমি মরিয়া হয়ে কুকুর এড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি। যেতে যেতে শুধু দেখলাম দুটো মুখ বাঁধা বস্তা। গায়ে রক্তের ছাপ। আধা আলো আধা ছায়ায় যেন দুঃস্বপ্ন দেখলাম। যখন হুঁশ হল

দেখলাম, ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ি। যেটা আমার জানা ছিল। দু এক জনকে চোখে পড়ল। ইতিমধ্যে ঠন্‌ঠন্ আওয়াজ তুলে একটা ট্রাম এসে দাঁড়াল। আমি যেন ধড়ে প্রাণ পেলাম। কোন দিকে না তাকিয়ে ট্রামে উঠে বসলাম। ও মা, দুজন দেখি আমার সঙ্গে উঠল। ওই মুখ বাঁধা বস্তা দুটো পিছু নিল না তো? আমার সামনের সিটেই ওরা দুজন বসল। দেখে শুনে ওদের রকম-সকম ভাল লাগল না। আমি মরিয়া হয়ে রাস্তার দিকে দেখতে-দেখতে চললাম। ওদের দিকে টেরিয়ে দেখে মনে হল, একবার কী গুজুর গুজুর করছে আর আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে। আমি আমার জানলার বাইরে দেখছি আর 'ঠন্‌ঠনে' মা'র নাম জপতে জপতে শ্যামবাজার খুঁজছি। যেন শ্যামবাজার দেখলেই জানলা দিয়ে লাফ দেব। গোটা ট্রামের কামরায় ওই দুজন ছাড়া আমি আর এক-দুজন যাত্রী।

প্রাণ হাতে করে বাড়ি ফিরলাম সেদিন। 'ডেভিড'-এর সত্তা তখন আমার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তখন 'তিরিশ বি' বাস ভূপেন বসু এভেনিউর মুখ থেকে ছাড়ত। বাড়ি ফিরতে প্রায় আটটা বেজে গেছিল। বাবা ইদানীং রাস্তাঘাটের গণ্ডগোলের জন্য আটটার আগেই বাড়ি ফেরেন। সেদিন আরও আগে ফিরেছেন। মার সামনে যেতে ধমক খেলাম, 'এই তোমার তাড়াতাড়ি।'

১৯৪৮ সাল। একদিন আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে স্থির করলাম বর্ডারে যাব। পাঁচজনের মধ্যে আমি, তরুণ, দীপক, বিষ্ণু আর কুশল। আমাদের সঙ্গে কানাইকে নেবার কথা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওকে অনেক ভেবে বাদ দিতে হয়। নিলে কখন কী করে বসে, কেউ জানে না। যা বদ্‌রাগী! থাকলে অবশ্য আমাদের সাহস বাড়ত। শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে থাকলেও নেওয়া গেল না।

আমরা সামান্য কয়েকটা টাকা নিয়ে এক সোমবার ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। মাকেও যথারীতি বুঝ দেওয়া গেল কোনমতে। বাবাও তখন কয়েকদিনের জন্য অফিসের কাজে বাইরে গেলেন। এই মোক্ষম সুযোগ হাতে পেয়ে কে ছাড়ে। আমাদের উদ্দেশ্য বর্ডার থেকে পূর্ব পুরুষদের ভিটে দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা।

আমি ছাড়া পূর্ব পুরুষদের ভিটে সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না আর কারও।

ক্যান্টনমেণ্ট থেকে ক'টায় কোন ট্রেন, আগের দিন জেনে এসেছিলাম। পরের দিন যথা সময়ে স্টেশনে পৌছলাম। তখন ট্রেনগুলোর রং ছিল সবুজ। কয়লার ইঞ্জিন। কামরার গায়ে 'ই, আই, আর' কথাটা লেখা থাকত। এখনকার মত ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ক্লাশ ছাড়াও ইণ্টার ক্লাশ ছিল। শাসক শ্রেণীর কী

বুদ্ধি! প্যাসেঞ্জারদের মধ্যেও তিনটে 'পাঁচিল' তুলে দিয়েছিল। ধনী মানে ফার্স্ট ক্লাশ, মধ্যবিত্তদের জন্য ইণ্টারক্লাশ আর গরীব শ্রেণীর জন্য থার্ড ক্লাশ। ভাড়াও এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল। আজকের দিনে ভাবাই যায় না। তবু সাধারণ মানুষ প্রয়োজন ছাড়া ট্রেনে চড়ত না। অনেকক্ষণ বাদে ট্রেন আসত। উদ্বাস্তুর চাপে কিছু ট্রেন বেড়েছে।

ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশন সংলগ্ন জমিতে উদ্বাস্তুরা ইতিমধ্যে ডেরা বেঁধেছে। এলোপাথারি জীবন। স্থায়ী আস্তানার এবং কাজের সুযোগের অপেক্ষায় আশায় বুক বাঁধছে। বরিশাল, খুলনা, ঢাকা, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অ্যাকসেণ্ট-এ গালাগালি, ঝগড়াঝাঁটির শোরগোল। শুধু সুবিধাজনক আস্তানা দখলের কারণে। কেউ কারুকে চেনে না। সরকারি রিলিফ বাবুরা রিলিফ দিতে জেরবার। হুড়োহুড়ি সামলাতে পুলিশ হিম্‌সিম্। মানবিক কারণে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার হুকুম নেই। সাত সকালে জল নিয়ে মারামারি। লাইনের পাশেই মেয়ে পুরুষ লজ্জা সরম বিসর্জন দিয়ে প্রাতকৃত্য সারছে। পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন। যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের কল্পনার বাইরে।

হাত পা ওয়ালা মানুষের বিচিত্র পশু-জীবন। ওপারের নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তের মধ্যে কোন তফাত নেই। উচ্চবিত্ত সুবিধাভোগীরা যে কোন দুর্যোগে যোঝবার ক্ষমতা রাখেন, তাই তাঁরা এ বর্গে নেই।

আকস্মিকভাবে এক চিল-চিৎকারে আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সম্বিৎ ফেরে। পেছন ফিরে দেখি দুটি শিশুর মধ্যে একটা কলা নিয়ে হনুমান-সুগ্রীবে লড়াই চলছে। দুটি শিশুই উলঙ্গ। কুশল (আমাদের বন্ধুদের একজন) ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

কুশল একটু নরম মনের মানুষ। ঘটনাটা এই রকম—বাচ্চাদুটোর চেহারা দেখে কুশল থাকতে না পেরে দুজনকে কাছাকাছি ফলওলার কাছ থেকে দুটো কলা কিনে দুজনের হাতে দেওয়ার জের এই ঘটনা। একজন, যে আরেকজনের চেয়ে শক্তপোক্ত সে শেষ পর্যন্ত দুটো কলাই উদরস্থ করে। আর একটা বাচ্চার প্ল্যাটফর্মে শুয়ে আথালি পাথালি চিৎকার। কুশল বোকা বনে গেছে।

আমি বললাম, 'তোর অত আদিখ্যেতা দেখানোর কী ছিল? মনুষ্য নয় তো, দয়ার সাগর ঈশ্বর চন্দর! এখন এখান থেকে সরে পড়ি চ, যদি বাঁচতে চাস্। বাচ্চাটা চেঁচাতে চেঁচাতে 'পটল তোলা'র এভ্‌রি চান্‌স। যদি সত্যি সত্যি তাই হয় আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।' 'ফাঁসি কাঠে ঝোলার আগেই খেঁকুরে উদ্বাস্তুর দল আমাদের ছিঁড়ে খাবে' বিষ্ণু এই কথা বলে

কুশলকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ঐ বাচ্চাটার থেকে অনেক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। আমরাও ওদের অনুসরণ করলাম। কুশল তখনও ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে।

তখনও রেল সম্পদ ভাগ করে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তোড়জোড় চলছে। জনসমুদ্রের এপার ওপার করতে দুই তরফের কর্তৃপক্ষ বেসামাল। অন্য দিকে মনোনিবেশ করার অবসর মিলছে না। কর্তব্যরত কর্মচারীরা ভাববে, এ কী ঝামেলা রে বাবা, খাল কেটে কুমির (দেশ ভাগ) ডেকে আনা। কেউ কেউ আবার মেওয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। শেয়ালেরা শ্মশানেই ধন্ধবাজ হয় বেশি।

আমরা খুলনাগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম শেষ পর্যন্ত। এটা আমার দ্বিতীয় পর্যায়ে খুলনাগামী ট্রেনে চড়া। আগের পর্ব উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে।

উনিশশো একচল্লিশ সাল কেটেছে দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশনে। সেই যেবার কবিগুরুর মহাপ্রয়াণ হয়েছিল। আমরা বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা দু-মিনিট নীরবতা পালন করেছিলাম। তখন শুধু জানতাম কোন বড়লোক মরে গেলে মিনিট দুয়েক গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকলেই হবে। আমার আগের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। তিনি আকস্মিক ভাবে মারা গেলে সেদিনও আমরা শিক্ষকের নির্দেশে ঠিক দু মিনিটই মৌন ছিলাম। সব মৃত্যুরই এক দাম। শুধু রবি ঠাকুরের কবিতা থাকত বইয়ের পাতায় আর তাঁর লেখা গান শোনা যেত। তখন বুঝিনি, এখন বুঝি ভারতবর্ষের দু-শো বছর নীরব থাকা উচিত ছিল। অতবড় প্রতিভার মৃত্যুতে দু-মিনিট মাত্র ?

উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল, আর এক দুর্যোগের বছর। ইতিহাসে রাজায় রাজায় 'ঢাল তরোয়ালের যুদ্ধ' আন্দাজ করতে পারি। বিমান, বোমা, কামানের যুদ্ধ শিয়রে। কেমন সে যুদ্ধ দেখতে ইচ্ছে করে বালকের চোখ দিয়ে। কীরকম ভাবে বলি, যেমন ধরুন, একটা জাপানী যুদ্ধ-বিমান টুক করে একটা বোমা ফেলবে আর আমরা ছোটরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সেটা দেখে যুদ্ধকে উপভোগ করব ! কী বিচিত্র এই বালক-মন।

সেই প্রথম সাইরেন শুনলাম। দেখলাম 'বাফার ওয়াল'। যুদ্ধ আমাদের 'বাফার' কথাটা বই না পড়েই শেখাল। অর্থাৎ সংঘর্ষ নিরোধক 'পাঁচিল'।

সেই প্রথম সাইরেন শুনে কী আতঙ্ক আর রোমাঞ্চ মেশানো উপলব্ধি। শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে। আর এখন জন প্রতিনিধিদের গাড়ির আগে পিছে সাইরেন বাজলে বলি শব্দ দূষণ। মন্ত্রী মহোদয়রাও বলেন মাঝে মধ্যে। কারণ

আমার 'কান' আর তাঁদের 'কানে'র কাজ শোনা অর্থাৎ আমারও যা 'মহামান্ত' তেনারও তাই।

সমস্ত সরকারী অফিসের সামনে দেওয়াল তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ 'বাফার ওয়াল' তৈরি হচ্ছে। ঠিকেদারদের পোয়া বারো। তবে আজকের 'প্রোমোটার'-দের মতো নয়। কোটি কোটির আমদানি। এক আধটা বাড়ি ভেঙ্গে পড়তেই পারে। মানুষ বই তো ভগবান তৈরি করে না। দু-পাঁচ জনের নাম চিত্রগুপ্তের খাতায় তোলা থাকতেই পারে।

বাস্তবে মাঠে-ঘাটে ইংরাজী 'এম' বা 'এল' অক্ষরের আকারে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে। অনেক সরকারি বাড়ির সামনে রাজ্যের বালির বস্তার দেওয়াল।

এ. আর. পি. বাহিনী তৈরি হল। আমাদের দাদারা ঘন নীল পোশাক পরে প্যারেড করছেন। আর আমরা যারা ছোট, বড় বড় চোখ করে গর্বের সঙ্গে দেখছি।

কেরানি কুলের সন্তানরা যুদ্ধের দৌলতে হঠাৎই জঙ্গী হয়ে উঠল। আমাদের ভাবনা, কামান-বন্দুক নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে ওরা যুদ্ধ করবে। আমরা তাই দেখব, আর দাদাদের সাহায্য করব। কিন্তু যখন জানলাম ওরা যুদ্ধ করবে না, আমরা একটু হতাশ হলাম। তবু উত্তেজনার ঘাটতি নেই আমাদের।

ওদের কাজ ছিল, বিমান আক্রমণের সময়, নাগরিকদের সজাগ করে দেওয়া। কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হবে সে কথা জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া। রাস্তার সব আলোয় কালো রং করে টিনের চোঙা পরিয়ে দেওয়া হল, যেন বিমান থেকে নিশানা দেখা না যায়। যে সব বাড়িতে কাঁচের জানালা আছে তার ওপর 'গুণ' চিহ্নের মতো করে খবরের কাগজ ফিতের মতো কেটে লাগিয়ে দেওয়া হল। বোমা পড়ার ঝাঁকুনিতে কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো না হয়ে যায়।

সন্ধ্যের পর কোন ঘর থেকে আলো বাইরে এসে পড়লে এ. আর. পি-রা সাবধান করে দিত।

আমার মনে আছে ঘরের সব আলোতে কাগজের ঠোঙা কেটে বাল্‌বে পরিয়ে দিয়েছিলাম। গাড়ির হেড্‌লাইটের অর্ধেকটা আলকাতরা দিয়ে ঢাকা থাকত

রাতের পরিবেশ অনেকটা ভুতুড়ে লাগত।

যখন সব দিক দিয়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জনের অপেক্ষায়, একদিন বাবা অফিস থেকে ফিরে বললেন, 'আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।'

আমাদের বাড়ি বিমান ঘাঁটি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বিপদের আশঙ্কা আছে তাই আমাদের সংসারকে তিন ভাগ করে তিন জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

এই ব্যবস্থা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কথা বলার সাহস ছিল না।

বাবাকে ছেড়ে থাকা আমার পছন্দ নয়। অফিস করতে হবে তাই একটা ঘরে তিনি একা থাকবেন। অন্য ঘরে এম. ই. এন-এর কর্মীদের মেস হবে। তাছাড়া যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

কী করা যাবে? বাবার সিদ্ধান্ত মানতেই হল। তখন বাবাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবলেই আমার মন ভার হয়ে যেত। বাবাকে যেমন ভয় পেতাম তেমনি ভালবাসতাম। পুরো একটা বছর ছাত্রাবাসে কাটল। মাঝে মধ্যে এক-আধ দিন সেখানে বাবাকে পেলে ছায়ার মতো আগলে রাখতাম। সে যে কী শান্তি বলে বোঝাতে পারব না।

দেখা হলেই বলতাম, 'এখানে আমার একদম ভাল লাগছে না। বাড়ি নিয়ে চল।'□

আত্মজীবনীমূলক লেখকের 'দাঙ্গা, নির্বাসিত জীবন ও মুখের মিছিল' গ্রন্থের অংশবিশেষ। গ্রন্থটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক। অঙ্কন : লেখক।

শুভেচ্ছা যোগসূত্রকে

অর্ঘ বসু

ও

অমিতেশ বসু

রবি সেন

....

ঝুলনের হনুমান

কোন ডালে পাখি বসবে সে কথা কেউ জানত না। একতরফা ডিক্রি পেয়ে জেলা-আদালতের পাইক-পেয়াদা নতুন সেনের বাড়ির আসবাব-পত্র ক্রোক করতে এলে খবর পেয়ে যারা উড়ে এসেছে তাদের মধ্যে পড়শী ছেলের দলই অন্দরে গলা বাড়িয়েছে। শোনা কথা—দেনাটা অনেক পুরানো আর মামলাও ঠোকা ছিল অনেক আগে। নতুন সেন এসব গ্রাহ্য করেনি। তা আদালতের লোক-লস্করের সঙ্গে শহরের উঠতি ঠিকাদার গোপালবাবুও এসে হাজির, সে পাওনাদার। নতুন সেনকে সে যখন বলল, "কিছু মনে করবেন না, ভাই।" তখন নতুন সেন রহস্যের হাসি হেসে জানাল, "কিস্স্যু না, কিস্স্যু না, জঞ্জাল পরিষ্কার হোক।" এই বেপরোয়া তুড়ির সামনে পাওনাদার গোপালের ভাবান্তর লুকোচুরি খেললেও, কটু দৃশ্যের মধ্যে বেওয়ারিশ ভিড়ের সঙ্কোচ অনেক হাল্কা হল। তবু গায়েপড়া দর্শক হিসাবে পাড়াপড়শীর ভিড় নতুন সেনকে অখুশি করেছে, এমন আন্দাজ ঠিক তখনই মেলেনি। তবে একে অভিজাত ভঙ্গি বলা চলে কিনা সে মতান্তর মুলতবী রেখেও নতুন সেন বনাম গোপাল কন্ট্রাকটরের দড়ি টানাটানিতে ভিড়টা নিরপেক্ষ না পক্ষপাতময় এমন জবাব কান মুলে আদায় করা চলে না।

তাছাড়া নতুন সেনের আচরণ কলার পাতায় লেখার মত সহজ কিছু নয়, আর শেষ তক এ বাড়ির নাগাল পাওয়াই কি খুব সহজ একটা কাজ ছিল?

"এদিকে নয়, এদিকে একেবারেই নয়।"

এদিকে নয়, এটা ঠাকুর ঘর। গৃহ দেবতার পাট। তাই ফিরতে হলো একটা লম্বা হলঘরের মধ্য দিয়ে। ছাদের এখানে সেখানে টালি না থাকায় ঘরের মধ্যে আকাশ ঢুকে পড়েছে। অথচ এখনও পরগাছার মতো ঝাড়-লণ্ঠনের কাঁচ জায়গায় জায়গায় টুংটাং বাজে। তাই ওপরে তাকাতে হয়। তাকিয়েছেও কেউ কেউ। আর টুকরো জিজ্ঞাসা টুকরো রহস্যের মতই ঘুরপাক খায়। ঠিকাদার গোপালকে সেই অনুসন্ধানী দলের মধ্যে কেমন সন্দিগ্ধ মনে হল।

আড়ালে কোর্টবাবুকে ডেকে সে বলে, "উঁকি মেরে ঠাকুর" ঘরটা একবার দেখলে হত না ?" এ কথায় কোর্টবাবু দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে, "আরে মশাই, গলা বাড়াতে গেলে বলবে গৃহদেবতার সামনে গৃহকর্ত্রী এখন ধ্যান করছে।" চোখ টিপে কথা শেষ করে কোর্টবাবু আশেপাশে তাকায়। মোলায়েম করে বলে, "গোপালবাবু, নতুন সেনের বউকে কোনদিন দেখেছেন ?" গোপাল, "শুনেছি ওর ঈশ্বর পিতা কৃষ্ণনগরের পুতুল দেখিয়ে ঘটকদের চোখের সামনে ছড়ি আস্ফালন করে ফরমায়েস করতেন—"এরকমটা চাই।"

"কী রকম ?"

"অ্যাই পুতুলের মতো নিখুঁত আর কি।"

কোর্টবাবু ফুট কাটল, "ওর বাপ-ঠাকুরদার বাগান বাড়ির মেয়েছেলেগুলোর চেয়েও সুন্দরী !"

"জানি না, মশাই, এসব কেচ্ছায় ফয়দা কী।" মনে হল এ আলাপে গোপাল ভাসতে চায় না। তাই কোর্টবাবু অনেকটা স্বগত বলে, "ভোগ করে গেছে বলতে হবে, অ্যা, কী বলেন ? "

যখন রাস্তার ট্রাকে মালপত্র ওঠানো শেষ, গোপাল বাগানে কাকাতুয়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথা থেকে নতুন সেন হা হা করে দৌড়ে এল। বলে কী না, 'এটা লিভিং থিঙ !" অর্থাৎ এর গায়ে হাত দেওয়া চলে না ঘটি-বাটির মতো। গোপাল তত আহাম্মক নয়। সে সরে এল। এ সময় কোর্টবাবু নতুন সেনের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে, "রায়বাহাদুরের আমলের নাকি পাখিটা, কত বয়স হবে ?" নতুন সেন সিগারেট নিল, কোন উত্তর দিল না, একটু হাসল। পরে কোর্টবাবুকে বলল, "আপনার লোকজনকে বলুন, এবারে -"এ কথায় কোর্টবাবু তাড়া লাগায়। কাগজপত্রে সই সাবুদ করে সবাই যখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন গোপালের মনে হল সে ঠকে গেছে।

পাখির বয়স হয়েছিল। যদিও বয়সী পাখির কর্কশ চিৎকারে এ পাড়ার নিতান্ত বালক-বালিকারাও আর মজা পেত না, তবু টুকরো রহস্যের মতো সকাল-সন্ধ্যে বাগানে টাঙ্গানো থাকত, যেখানে গোপাল দাঁড়িয়েছিল। আর বাগান ? নিতান্তই কথার কথা। আসলে মণীন্দ্রকাঁটার ঝোপ সেখানে জাঁকিয়ে উঠেছিল। তবে গোটা চারেক থাম তখনও খাড়া দাঁড়িয়ে। আর তাতে ঠাওর হয়, ভেঙ্গে পড়তে পড়তেও এই সাবেকী ঐশ্বর্যের শেকড় মাটির অনেক গভীরে।

যেমন এই বাড়িটা। যার অর্ধেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। ভিত আলগা হয়ে এলেও ধ্বস্ত কাঠামো টিকে আছে। যেমন ছাদের মাঝখানে ভাঙ্গাচোরা থাবা সমেত সিংহের মাথাটা, যার ওপর হাবুল বসেছিল বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। আর সূর্যাস্তের আগে হাবুলকে আবিষ্কার করতে পারায় এতক্ষণে হুঁশ হয়, সত্যিই তো, নতুন সেনের ছেলেটাই বা তুপুর-বিকেল কোথায় ছিল !

সন্ধ্যারাত্রি।

কিন্তু এ বাড়ির সুড়ঙ্গপথে রাত অনেক আগেই এসে গেছে। সুড়ঙ্গপথ অন্ধকার এবং শেষ দেখা যাচ্ছে না—এরকম বলা চলে না। কেননা সুড়ঙ্গপথের শেষে এ বাড়ির অন্য তরফের কর্তাবাবু উলঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিল।

কর্তাবাবু সন্ধ্যারাত্রির আঁধারেও যেমন, দিনের আলোয় তেমনি উলঙ্গ। বেশভূষা বলতে যা, তা বাড়ি থেকে বের হলে, কালেভদ্রে। কোঁচানো ধুতি, আদ্দির ফতুয়া, মুগা চাদর আর হাতে লাঠি। চলেছেন তিনি। চোখে সোনার চশমা আর পায়ে ভেলভেট পাম-সু। কিন্তু স্বগৃহে তিনি উলঙ্গ আর এ খবর রাখে তার নাত-বৌ, ছেলে, বয়স্থা মেয়ে আর অবশিষ্ট তু-একজন চাকর-বাকর। তা ছাড়া নতুন সেনের কিশোর ছেলে হাবুলও এসব দেখেশুনে বড় হচ্ছে। আর সূর্যাস্তের আগে হাবুল যখন সিংহের মাথার ওপর বিপজ্জনক ভঙ্গিতে বসে, তখন কর্তাবাবু উলঙ্গ, সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে জলসাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তবলা-ডুগি, হারমোনিয়াম আর ভাঙ্গা এস্রাজের জটলায় তু-একটা হুরী-পরী বা ন্যাংটো মেয়েমানুষের তৈল চিত্রের মধ্যে কিছুক্ষণ হারিয়ে গিয়ে আবার সুড়ঙ্গপথ উলঙ্গ অতিক্রম করবেন তিনি। তখন অন্ধকার জমাট বেঁধেছে এ বাড়ির আনাচে কানাচে ; গোসাপেরা চলাফেরা করছে। বাগান থেকে বয়সী কাকাতুয়া এসে গেছে অন্দরে।

কিন্তু আজ অন্যরকম। বাগান থেকে বয়সী পাখিকে কেউ অন্দরে আনে নি। প্রাচীন এক কুর্সিতে বসেছিল যোগমায়া। আসবাবপত্রের মধ্যে পাইক-পেয়াদার হাত থেকে এই সিংহাসন-সদৃশ আসন কী করে রেহাই পেল সেও এক রহস্য, ঠিকাদার গোপাল যা ভেদ করতে পারে নি। নতুন সেন যোগমায়ার সামনে মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়েছিল। আকাশে ভাঙ্গা চাঁদ ছিল, ঘরের মধ্যে এলোমেলো হাওয়া। পাম গাছের শীর্ষে বাতাসের শব্দ উঠেছিল। হাবুল মাকে জিজ্ঞাসা করল, "আজ থেকে তাহলে মেঝেতেই বিছানা হবে ?"

যোগমায়া ও কথায় নতুন সেনের দিকে তাকাল। কিন্তু নতুন সেন বাইরে চোখ মেলে দিয়েছে।

হাবুল ফের বলে, "বাবু কোথায় শোবে ?"

ও কথায় যোগমায়া বাবুকেই দেখিয়ে দিল। নতুন সেন রা করল না।

একটু পরে হাবুল বলল, "আমি আজ থেকে আলাদা শোব, আমি বড় হয়ে গেছি।"

"না, তুমি আমার আর বাবুর সাথেই শোবে।" যোগমায়া চাপা গলায় কথা কটি বলে। এক ডৌল ব্যক্তিত্ব তার স্বরে ধরা পড়ে।

"না, আমি বড় হয়ে গেছি, তাছাড়া—"

যোগমায়া আয়ত চোখে ছেলেকে বিঁধতে চাইল। হাবুল তথাপি মাথা নাড়তে থাকে।

"তাছাড়া আমার ভয় করে।"

"কীসের ভয় ?" যোগমায়া ছেলের ভয়ের কথায় অবাক হয়েছে।

"আমার ভয় করে।"

যোগমায়া তাকিয়েছিল। নতুন সেন মুক্ত জানালায় তফাতে থেকে এই কথোপকথনের কেন্দ্রে সন্তর্পণে পৌছতে চাইছিল।

এমন সময় হাবুল আবার কথা বলে ওঠে, তার ভয়ের কথা।

"একদিন বাবু আমাকে ঘুমের মধ্যেই বিক্রি করে দিয়ে আসবে, আমি জেগে উঠে—" যোগমায়া অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে এবং ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। নতুন সেন ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অনেক রাত। তারা তিনজন পাশাপাশি শুয়েছিল, বৃত্তের মতো। হাবুল এক স্বপ্নহীন ঘুমে ডুবে যাচ্ছিল। তার মুখে আলো-আঁধারের কোন মরীচিকা ছিল না। দু'জন জেগেছিল। এবং বিনিদ্ররাত্রির নাটক শুরু হবার আগে নতুন সেন প্রস্তুত হচ্ছিল বা। যোগমায়া হাবুলকে জরিপ করছিল। নতুন সেন যোগমায়াকে ডাকল, নাম ধরে। এ বাড়ির প্রথাসিদ্ধ সম্বোধনের প্রাচীনতা লঙ্ঘন করে। যোগমায়া স্বামীর দিকে তাকিয়েছে। নতুন সেন চোখ নামাল না।

"আজ তোমাকে রাত্রির সাজে দেখতে চাই।" একান্ত অনুরোধ না আদেশ কণ্ঠস্বরে তা ধরা গেল না। যোগমায়া প্রস্তাবের আকস্মিতায় চকিত হয়েছে। তার দেহ-মনে কোন আবেগের সঞ্চার হয়েছে কিনা তা বোঝার আগেই সে বলে, "কী দিয়ে সাজব আমি, কোন অলঙ্কারই তো আর অবশিষ্ট নেই।" সে নতুন সেনকে জরিপ করতে থাকে। একে একে এ-বাড়ির সোনা-দানা, প্রাচীন আসবাবপত্র সবই নতুন সেন দিনে-মানে বিক্রি করে এসেছে। অবশিষ্ট

আজ বিকেলে ক্রোক হলো। কখনো প্রকাশ্যে, বেশি সময় গোপনে এসব চলেছে। এমন কি দেওয়ালের তেলরঙের ছবিগুলিও বাদ যায়নি। এসবের মধ্যে তাদের দাম্পত্য-জীবন ও হাবুলের বড় হয়ে ওঠার দিনগুলি। মধ্যরাত্রিতে নতুন সেনের প্রস্তাব তাই আজ যোগমায়াকে ভিন্ন অর্থে উস্কে দিল। কিন্তু কোন বিস্ফোরণ ঘটল না ; আরও বিস্ময় বাকি ছিল।

"কেন, রূপোর চন্দ্রহার, কানপাশা, বাজু-বালা, টিকলি, নাকচাপি। আর সেই বিয়ের রাণী-বেনারসী, কেমন ?"

একথা শুনে যোগমায়া মাঝরাতে মাতা কালীর মতো জিভ বের করল। বাইরের পৃথিবীতে কোন ঝড়ের আভাস ছিলনা। যোগমায়া বলল, "সে সব তো দেবতার থানে অধিষ্ঠিতা রাধা মূর্তির অলঙ্কার।"

"তাতে কী, দেবীর অলঙ্কার সময় বিশেষে মানুষের গায়েও ওঠে।" প্রায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো নতুন সেনের বিধান মনে হল। এবং কী আশ্চর্য, কিছু পরে যোগমায়া রূপোর চন্দ্রহার, নাক চাবি, বাজু-বালায় ও পুরানো বেনারসীতে রাধা হলো। তখন নতুন সেন বলে, "দেখবে বউ, আগামী ঝুলন পূর্ণিমায় অনেক টাকা-কড়ি নিয়ে ঘরে ফিরব।" ফেরার কথায় যাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠে। তাই সে বলে, "মনস্থির করেছি, পুত্রকে নিয়ে বাণিজ্যে বের হব।"

যোগমায়া স্বামীর হাতে হাত রাখে। এসবের কিছুই হাবুল জানতে পারেনা।

ভাগীরথীর তীরে নৌকা ভিড়িয়ে ছেলের দল অনেক আগেই নসিপুরের রাজবাড়ির ঝুলন দেখতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। এরা নতুন সেনের পাড়া-পড়শী। ঝুলন উপলক্ষে মেলা বসেছিল জমজমাট। জুয়োর আড্ডা, খেমটা ও আলকাপও এখানে ওখানে জমে উঠেছে। রাজবাড়িতে ঢোকার মুখে যে মানুষটা হনুমান সেজেছে তার একহাতে মস্ত রূপোর থালায় টাকা-আধুলি জমা পড়ছিল। অন্য হাতে গদা। তবে লেজ ছিল না। সাজগোজে বৈচিত্র ছিল বৈকি। যেন মানুষ-হনুমান বা হনুমানই মানুষের কাছাকাছি। তায় হনুমানের গলায় রামায়ণের দু-এক কলি গান, তাতে ধ্রুপদের ছোঁয়া। শিশুরা মজা পেয়েছে। ছেলেদের মিশ্র অনুভূতি ও বুড়োর দল ভক্তিরসে মাথা নাড়ছে—যুবতী ও প্রৌঢ়ারাও দাঁড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যা থেকে টানা মধ্যরাত্রি হনুমানজী অর্ধদেবতার মতনই রাজবাড়ির ফটক মাতিয়ে রেখেছে। সারারাত ধরেই লোক সমাগম ছিল, দূর দূর থেকে। তাই সারা রাত ধরেই নানান মজার ব্যবস্থা ছিল। নতুন সেনের পড়শী ছেলের দল সারারাত ধরে এরকম মজার

সন্ধানে শেষরাতের কাছাকাছি মেলা থেকে দূরে, তফাতে, বাবলার বনে হাবুলের সন্ধান পেল। কে জানে কত সময় ধরে নিভৃতে এই অপেক্ষা। ওদের প্রশ্নের জবাবে হাবুল চোখ বড় করে তাকিয়েছে। পূর্ণ মানুষের চোখে যেমন ক্লান্তি ও বিদ্রোহ থাকে তেমনি। এ সময় দূরে শব্দ উঠলো, ভাগীরথী পাড় ভাঙ্গার মতো। ছেলের দল গা ঢাকা দিল। সন্ধ্যা রাত্রির হনুমান অনেকটা মানুষের মতই হাবুলের দিকে এগিয়ে আসছে। হাবুল উঠে দাঁড়ায়। আগন্তুক ছদ্মবেশ চুকিয়ে ফের মানুষের রূপ নিলে ছেলের দল দেখতে পেল নতুন সেন হাবুলের হাত ধরে লোক সমাগমের দিকেই রওনা দিল।

রাত্রিশেষের আকাশে ঝুলনের চাঁদ আর মাটির পৃথিবীতে ঝুলনের হনুমান ; মাঝখানে হাবুলকে নিঃসঙ্গ নদীপ্রান্তরে আবিষ্কার করে ছেলের দলের অনুভূতি কোন মানবিক বাঁকা-চোরা খাতে বয়ে গেছে সে কথা আমরা জানিনা। কিন্তু আমরা এ কাহিনীতে হাবুলকে প্রথমে দেখি সূর্যাস্তের আগে সিংহের মাথার ওপর বিপজ্জনক ভঙ্গিতে বসে। ঠিক এখানেই এ বৃত্তান্তের ইতি হতে পারত। কেননা সেই রাত্রির প্রতিশ্রুতিমতো নতুন সেন বাণিজ্য করে ঘরে ফিরবে বৈকি।

কিন্তু পাঠক, মানুষই যেহেতু মানুষের পরিণতির আকাঙ্খা করে, তাই দিন কয়েক পরে শহরের পথে পথে হাবুলকে দেখা গেল 'লে লে বাবু ছ আনা'র ঠেলাগাড়িতে ঠাসা মালপত্র নিয়ে হাঁকছে। আর কাকাতুয়া-বাড়ির একটা ঘরে অনেক রাতে তারা দু-জন জেগে। হাবুল এখন অন্য ঘরে শোয়।

"আরেকবার সাজতে হবে বউ, সেইদিনটির মতো। আমি কথা রেখেছি।"

"কী দিয়ে সাজব বল, কী আছে আমার ?"

"কেন চন্দ্রহার, বাজু-বালা—রাধার যা যা আছে ?"

"সে অলঙ্কার আমি বিক্রি করে দিয়েছি।"

"দেবতার অলঙ্কার, আমাকে না জানিয়ে বিক্রি করে দিয়েছ !"

"হ্যাঁ, তা দিয়ে আমি ছেলের ঠেলা-গাড়ি ভর্তি করেছি।"

নতুন সেন গর্জন করে ওঠে, "এ পরিবারে অবাধ্য স্ত্রী লোকের শাস্তি কী জান ?"

"কী, মৃত্যু ?" যোগমায়া অবাধ্য হাসতে থাকে।

"আজ তোমাকে শাস্তি পেতে হবে," নতুন সেন পা বাড়ায়, হয়ত চাবুকের খোঁজে ; যে চাবুক সে নিজেই বিক্রি করে দিয়েছে। এ সময় যোগমায়া বলে, "দেবীর অলঙ্কার ছাড়াও সাজা চলে। কিন্তু যুবতী স্ত্রী কার সামনে সাজবে শুনি ? একজন হনুমানের সামনে ?" অবাধ্য হাসতে থাকে সে। আর

নতুন সেন পাষাণের মতো স্থির হয়ে যায়, তবু ভেবে দেখে যোগমায়ার এই পরিবর্তনের কথা, অগোচরে, দিনে-দিনে, তথাপি হঠাৎই মনে হয় এই বাঁক নেওয়া—ঠিক নদীর মতো।

আগামী ভোরে হাবুল আবার শহরের পথে বের হবে ঐ কাকাতুয়া-বাড়ির সদর ফটক দিয়েই।

রোজ ভোরে। □

DISCBANC DISCOUNT CARD

A unique concept which allows you to avail discounts on 150 consumer products & services ranging from 2% to 50% through a wide network of 2000 shops and establishments throughout calcutta and its outskirts.

For more details write to :

DISCBANC SERVICES (P) LTD.

Sales Office : **18/42, DOVER LANE**

Calcutta-700 029

জয়ন্ত চৌধুরী

....

একটি শহিদবেদী ও একজন রাজমিস্ত্রীর ভাবপ্রবণতা

বৃষ্টি থেমে যায়। রাস্তার ওপারের গাড়ি বারান্দার তলা থেকে, দোকানের শেডের আশ্রয় থেকে আর পাশের ছোট্ট চায়ের দোকান থেকে পায়ে পায়ে ওরা বেরিয়ে আসে। ঘিরে দাঁড়ায় চট চাপা দেওয়া আধখানা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেদীটাকে। স্কুল বাড়ির ভেতরে আবদুলের সিমেন্ট মাখা হাত শুকিয়ে গেছে। রেজা আর কচির দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই ওরা ওপাশ থেকে উঠে আসে। বারান্দার তলার সিমেন্ট মাখার জায়গাটায় এগিয়ে যায়। কচি, অর্থাৎ দলের সবচেয়ে কম বয়সের যোগানদার বাচ্চাটা কোদাল টেনে নেয়— মাখা সিমেন্ট নাড়াচাড়া করতে থাকে। শক্ত চেহারার যুবক রেজা কচিকে ধমক দেয় আর আঁটো হয়ে আসা সিমেন্টের দিকে তাকিয়ে বলে 'পানি নে আয়"। কচি বালতি হাতে চৌবাচ্চায় জল আনতে যায়। এতক্ষণে বিড়ি শেষ হয় দলের বয়োজ্যেষ্ঠ রাজমিস্ত্রি অভিজ্ঞ আবদুলের। কর্ণিকগুলো সিমেন্টের শানে ঠুকে নেয়, গেট পার হয়ে হাজির হয় বেদীটার সামনে। সেখানে যুবকেরা চাপা-দেওয়া চটটাকে সরিয়ে অসমাপ্ত বেদীটার সম্ভাব্য আকার-আয়তন ও দৃষ্টি-আকর্ষণের ভূমিকা নিয়ে ছেঁড়াখোঁড়া কথাবার্তা বলছিল। ওদের একজন আবদুলকে প্রশ্ন করে,

'—আর কতক্ষণ লাগবে ?

—আর পানি না পড়লে জলদি হবে।

—একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও ভাই, চারটে বেজে গেল—

—এ মেশিনের কাজ কি ? হাতের কাজে টাইম তো লাগবেই।'

সিমেন্টের কড়া নিয়ে হাজির হয় কচি। আবদুলের অভ্যস্ত চোখ মাপজোক দেখে নেয়। ইঁট তোলে, ভাঙে, স্তরে স্তরে গেঁথে দেয় তার দীর্ঘ জীবনের অর্জিত পেশাদারী দক্ষতায়। কঠিন এক নিয়মবশত যে হাতের নিবিড় বাঁধন থেকে একদিন কবে ঠিক্‌রে বেরিয়ে গিয়েছিল লাঙলের হাতল, আর কবেই বা কঠিনতর এক তাগিদবশত সে হাত চেপে ধরেছে কর্ণিকের গোড়া! তারপর

চল্লিশবছরময় জীবনের বাঁকে বাঁকে অসহ্যতা, ক্ষোভ আর শোক। এ সবের প্রবল সংঘাত সত্বেও কোথায় যেন আপোসের রফা হয়ে গেছে জীবনের সাথে। স্থির, গম্ভীর এই মানুষটি তাই একটি শীর্ণগাছের মত বেঁচে আছে।

বালিমাথার কাজ শেষ করে একফাঁকে এই ভীড়ে জড়ো হয় রেজা। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে এক যুবক, বোধহয় তার ওপর ভার ছিল তদারকির, তার কাছে গিয়ে রেজা দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করে,

'—আপনারা এটা বানাতে লেগেছেন কেন ?'

যুবক রেজার প্রশ্নে উৎসাহিত বোধ করে। সহজ ভঙ্গিতে সে বিবরণ দেবার চেষ্টা করে এক বছর আগেকার একটি ঘটনার। তার কথার সুরে আন্তরিকতা,

'—এই যে আমরা—ছাত্ররা—যারা স্কুল কলেজে পড়ছি—তাদের ওপর যে দমন পীড়ন—আর কি নানারকমভাবে অত্যাচার চলছে—আমাদের দেশের শাসকরা যারা দেশটাকে চালাছে—তারাই এই অত্যাচার চালাচ্ছে। তা, আমরা গতবছর এইখানে একটা মিটিং করেছিলাম—একটা প্রতিবাদ-সমাবেশ, মানে আমরা সেখানে বলেছিলাম যে এই সমস্ত অত্যাচার, এই সব অন্যায় চলবে না—তখন একদল গুণ্ডা, যাদের শাসক পার্টি ভাড়া করে রাখে আমাদের মারার জন্য, তারা এখানে হামলা চালায়। ওরা বোমা ছোঁড়ে—একটা বোমা এসে লাগল আমাদের একজন কমরেড—একজন ছাত্র—তার মাথায়। সে শহিদ হয়। তাকে স্মরণ করেই আজকে আমরা এই শহিদবেদী তৈরী করছি, শহিদ দিবস পালন করছি।'

'—লোকটা বোমায় মরল, থানা-পুলিশ হলনি ?'

যুবক এইবার হাসে। সে রেজাকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে বলতে থাকে। রেজা অবাক হয় এবং প্রশ্ন করে, 'আপনারা কোন পার্টি ?' যুবক আবার এগিয়ে আসে এবং রেজাকে বোঝায়—এটা কোন পার্টি নয়, এটা ছাত্রদের একটা সংগঠনমাত্র।

এখনকার প্রসঙ্গের কথাগুলি রেজার কাছে স্পষ্ট হয় না। এখানে হাওয়ায় উড়ছে লাল পতাকা, টান টান করে বারান্দার গায়ে টাঙানো হয়েছে লাল ফেস্টুন। অথচ বলছে—পার্টি নয়। যুবকেরা ততক্ষণে একপাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল পরবর্তী কাজগুলি নিয়ে। অন্যপাশে একাকী রেজা পিছিয়ে যেতে থাকে ওর শৈশবে। সেখানেও গঞ্জের হাটের তল্লাটে যুবকের ভীড়। লাল নিশান উড়ছে। জড়ো হয়েছে চাষাভুষো মানুষ বোঝা-না-বোঝার চোখ নিয়ে। যুবকদের ভীড়ের মাঝে ব্যস্ত আখতার চাচা।

আখতার চাচা হকের কথা বলত। জমির হক। আখতার চাচা লড়াইয়ের কথা বলত। বাঁচার লড়াই। আখতার চাচা একদিন চলে গেছে। কেউ জানেনা কোথায়। আখতার চাচা ফেরেনি। আখতার চাচা অর্থাৎ বৃদ্ধ আবদুলের ছোট ছেলেকে এইভাবে মনে পড়তে থাকে রেজার। আজকের এই জনবহুল পথের পাশে শহিদ দিবস পালন করতে সামিল হওয়া এই যুবকদের রেজার খুব পরিচিত বলে মনে হয়। আখতার চাচার সহকর্মী সেদিনকার সেই যুবকেরা এদের অস্তিত্বে মিশে যায় যেন। কিন্তু একদিন শিশুমনে স্নেহ দিয়ে আখতার চাচা যে স্থান দখল করেছিল, অচেতনে লালিত হয়ে হয়ে সে স্থানটুকু রেজার যুবামনের গভীরে গভীরে এখনও রয়ে গেছে। তাই রেজার অশিক্ষিত অন্তঃকরণ আখতার চাচার নিরুদ্দেশের জন্য একান্তভাবে দায়ী করতে থাকে এই যুবকদের। এদের কার্যকলাপ তার কাছে ভীষণ অন্যায় বলে মনে হয়। এই অবস্থায় তার ভূমিকা কী হবে সে ভেবে পায় না। শেষ হতে থাকা শহুরে বিকেলে নিজের মধ্যে খেলে যাওয়া এই ভাবপ্রবণতাটুকু তার অসহ্য বোধ হয়। ওই বোমায় মারা যাওয়া ছেলেটার জন্য কি সে শোকার্ত হচ্ছে ? এত ভারী লাগছে এই বাতাস ! আখতার চাচা হয়ত একদিন বোমায়—না—এই যুবক তার ব্যক্তিগত জীবনবোধে এইসব মৃত্যুর কোন প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায় না। মৃত্যুগুলি তার কাছে কোন মহত্বের রূপ নিয়ে আসে না। তবু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছে সে। এই শহিদ বেদী নির্মাণপর্ব, শোকজ্ঞাপন-সভা—এসবের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত হয় অচেনা এক যুবকের মৃত্যু আর সাথে সাথে আঁকা হতে থাকে আখতার চাচার মৃত্যুর ছবি। আশ্চর্যভাবে রেজা আখতার চাচাকে এই স্মরণ-সভায় একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকায় নিয়ে আসে। আখতার চাচাকে ঘিরেই এই সমাবেশ, সভা, আয়োজন, শহিদবেদী……

'—রেজা, বালি আন রে', বৃদ্ধ আবদুল ডাকে। ওর হাত চলছে সহজ অভ্যাসে। রেজা বালির কড়া নামায়। তারপর একপাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে থাকে আবদুলকে। নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই অভিজ্ঞ বৃদ্ধের কাজের কৌশলগুলি লক্ষ করে যাওয়া ওর এক নেশা। এটা ওকে করতেও হয়। কারণ জীবিকার এই মাধ্যমটি বেশ প্রতিযোগিতাময়। সেরা হাতের কাজকে উত্তরাধিকারসূত্রে বাঁচিয়ে রাখতে হয় পেটের তাগিদে। আজ কিন্তু রেজা এই প্রশিক্ষণটুকু অবহেলা করতে থাকে। ও তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধের কর্মরত চোখদুটোর দিকে। রেজা জানতে চায় আবদুলের অন্তরের ভাবনাকে। নানা কি জানেনা ও কী গড়ে দিচ্ছে ওর নিপুণ কর্মদক্ষতায় ? ও কি শোনেনি

বোমায় মারা যাওয়া ছেলেটার কথা? নানার কি মনে পড়ছে না নিখোঁজ আখতার চাচাকে? ওর চোখের মধ্যে এসব কোন ভাবনারই হদিশ পাওয়া যায় না। .

বেলা শেষের সাথে সাথে কাজ শেষ করে আনে আবদুল। কচিটাও পাশের দেওয়ালে সিনেমার পোষ্টার দেখছে। আবদুল চোখ তুলে তাকায় রেজার দিকে, ওর এই দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে বোধহয় কোন বিপন্নতাকে আবিষ্কার করে ফেলে তার বৃদ্ধ চোখ, 'কীরে দাঁড়ায়ে পড়লি যে!' রেজা নিজেকে ফিরিয়ে আনে, সহজ হবার চেষ্টা করে এবং ততোধিক বিপন্নতায় উচ্চারণ করে, 'কাল বাড়ি যাব নানা।' বৃদ্ধ যুবকের অন্তবর্তী বিপর্যয়টুকু টের পায় এবং আশ্চর্য হয়। সারাদিনের এই কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনাই সে খুঁজে পায়না যার নাটকীয়তার মাত্রা এই পরিশ্রমী যুবকটিকে এক প্রবল নাড়া দিয়ে যেতে পারে। ও বুঝতে পারেনা শহরের অপরাহ্নের এলাকায় এই বায়ুমণ্ডল জুড়ে হঠাৎ কী পরিবর্তন ঘটে গেল যার ফলে যুবকের চোখে ভেসে যাচ্ছে দূরস্থ ঘরবাড়ি-মাঠঘাট-আকাশ-পৃথিবী আর চেনা মানুষেরা। এই গৃহকাতরতা ওর পছন্দ হয়না। কাজ করে বাঁচতে হলে এই শহরের বুকেই ধান্দা বুঝে নিতে হয়। আঠেরো টাকা রোজের দিনগুলিকে খুঁজে পেতে হলে এখানেই জ্বালিয়ে রাখতে হবে চোখ। রেজার এই শহরবিমুখতা তার পক্ষে ক্ষতিকর। এই মানসিক দুর্বলতাকে বরদাস্ত করতে পারেনা সে। কঠিন হয়ে উত্তর দেয়, 'বাড়ি গেলে চলবে কি? কাল নতুন কাজের কথা হয়ে আছে। আর বাড়ি যাবে, খাবে কী? ধানু মোড়লের চেয়ে চারটি খড় মেঙে খাবে কি?' এইসব কথার পর রেজাকে স্বাভাবিক হতেই হয়। কচিকে ডেকে নিয়ে বেদীর আশপাশে জমে থাকা ইঁট-বালি-সিমেন্টের অংশ ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকে। আবদুল উঠে ভেতরে যায় হাতমুখ ধুতে।

একসময় তিনজনেরই হাত-পা-শরীর সাফ হয় আর জামা-কাপড় পরা হয়ে যায়। রেজা চিরুণী দিয়ে চুল ঠিক করে। কচি ওর ভঙ্গিটি লক্ষ করে মনোযোগ দিয়ে। আবদুল কাঁধে ব্যাগওয়ালা যুবকটিকে প্রশ্ন করে, 'কী বাবু? কেমন হল?' সদ্যসমাপ্ত বেদীর দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বলে, 'ঠিক আছে।' সে পকেট থেকে টাকা বার করে। কিছু টাকা কম হয়। আবদুল বলে, 'দ্যাখেন, আপনার বন্ধুদের কাছে দ্যাখেন।' অন্য এক যুবক বাকি টাকাটা দেয়। আবদুল টাকাটা গোনে এবং লুঙ্গির গেঁজে রেখে দেয়। এরপর বেদীসংক্রান্ত দু-চারটে প্রশ্নের উত্তর দেয় সে। তারপর বলে, 'বোমা মেরেছিল যে, এখানেই

নাকি ?' ছেলেরা 'হ্যাঁ' জানাতে আবার হেসে বলে, 'ও বাপ! এখন যদি আবার ফেলে!' ছেলেরা অল্প হাসে, বলে, 'না না, কিছু হবেনা।' এখন আবদুল অন্য দুজনকে ফিরে যাবার জন্যে ডাকে, 'চল বাদশারা, মোরা ঘরপানে যাই।'

আবদুলের এতক্ষণকার নির্লিপ্ত অনস্থির ভাব, টাকা নেওয়ার ব্যাপারে পেশাদারী পরিচয় এবং যুবকদের সাথে কথোপকথনটুকু—সবকিছুই অত্যন্ত কর্কশ মনে হয় রেজার কাছে। আজকের এই নির্মাণপর্বের মাঝে কোন স্মৃতিই কি আবদুলের মনে নাড়া দিয়ে যায়নি—কোন শোক কি তুলে আনা হয়নি হৃদয়ের অতল থেকে—এ সমস্ত কিছু রেজার অজ্ঞাত থেকে যায়। আবদুলের কাছে এই কর্মসময়ের মুহূর্তগুলি একান্তই তাৎপর্যহীন রয়ে গেছে—এই ভাবনা রেজাকে বিড়ম্বিত করে। নিজ জীবিকার কর্মমাধ্যমে দক্ষ এই মানুষটি দীর্ঘজীবনের কর্মের অভিজ্ঞতার সাথে সাথে আর কোন বোধ অর্জন করে গেছে, যা তাকে শিখিয়েছে এইরকম কঠিন অথবা সহজ, খুবই সহজ হবার এক কৌশল—এইসব ভাবনার মাঝে ফিরতে থাকে রেজা, ফিরতে থাকে আরও দুটি মানুষ, রাত্রির সঙ্কীর্ণ আশ্রয়টুকুর জন্যে। □

ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও লাইব্রেরিকে সম্পন্ন করে তোলার মতো

জগন্নাথ প্রামাণিক

রচিত দুটি গ্রন্থ :

শিলাবতীর তীরে তীরে (উপন্যাস) ১৫·০০

চিত্ত-চরিত্র (ছোট গল্পের সংকলন) ২০·০০

প্রাপ্তিস্থান :

তারকনাথ বুক সিণ্ডিকেট

৬০বি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বিশ্ব মণ্ডল

....

১৯৯১

ছেলেটা চৌহদ্দির বাইরে চলে গিয়েছে—এরকম অভিযোগ মাতৃস্থানীয় আত্মীয় বা অনাত্মীয়ের কাছে শুনেছি ; জেনেছি এমন ভাবপ্রকাশ রসবোধের উপভোক্তা মাত্রেই সম্ভব ; তখনি উষ্ণ আবেগ তরঙ্গায়িত, 'ব্যবহারিক' ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রস্ফুটিত।

জন্মের কারণেই এই পীড়ন বা উৎপীড়ন ও তার মনোকেন্দ্রিক রসালাপ / বা পরিণতি !

আমার ভাবমূর্তি 'ভালমানুষ'—এরকম হাস্যকর পরিচয় ; হয়ত জেনেছি এ-সহজতম উপলব্ধি অন্যথায় সর্বদাই জটিল কাজেকর্মে নিয়োজিত হওয়া ; অসম্ভব বটে ! বন্ধুত্ব হয়ত আনুগত্য নয় ; জায়গায় জায়গায় আমার ব্যবহার ; 'অনুগত' যা মূলত আর একজন বন্ধুর, এ-সময়, মুহূর্তে মানুষের ব্যবহারিক 'সৌন্দর্য'—বিষয়ক মন্তব্যে······

দিনযাপনের ক্লান্তি-শেষে, অথবা শুরুতে 'ক্লান্তি'—শব্দের পুনরাবৃত্তিতে, হয়ত আমি বা আমার সম-সাময়িক নাগরিকবৃন্দদের একই অভিজ্ঞতা, বড়ই বেদনাদায়ক, ভাব এমনই দুঃসাহসী, বেপরোয়া অথবা উপরোক্ত যোগ্যতা থেকে তাঁরা বঞ্চিত।

তবে তো আমরা হাস্যকর ? বা বুদ্ধিমান ?

চৌহদ্দী পীড়ন-উৎপীড়ন সৌন্দর্য অনুগত ভালমানুষ ক্লান্তি···

জানিনা, ভাবি না ইত্যাদি শব্দের ঘন-ঘন বাবহারে সময় যেমত বিস্ময়ের অভ্যন্তরে অথবা প্রকাশের সক্ষমতায় অতিবাহিত, বা রোমাঞ্চিত মুহূর্তটিতে—মরুভূমির প্রান্তভূমিতে দাঁড়িয়ে যেমত বিস্ফারিত চক্ষু—দৃশ্যত বহুল প্রচারিত মেঘের আস্তরণে—সেই অনুভূতিসচল মুহূর্তটিতে, আমি, আমরা, প্রত্যেকে··· ।

তোদের এই ভেঙে পড়ার কারণগুলো আমি একেবারেই বুঝি না, এ-গুলো সহজ করে নিতে হয়, 'প্রেম আসলে মজার ব্যাপার, এই ছাখ না আমায় ;

আগামীকাল সজলের বাড়ি যাব—প্রেম-প্রেম ভাব করে, সময়কে নিংড়ে নিয়ে, উত্তেজনায় বা অনুত্তেজনায় পুনরায় আমি আমার প্রবহমান পথে ভেসে বেড়াব, যদি বলিস জৈবিক-ক্ষুধা তাহলে আমার কাছে অর্থ হয় 'কনট্রাক্ট' ব্যতীত অন্য-কিছু নয়, যেমন তোদের যে কারণেই হোক, যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমনটিও তো হতে পারে? মনের কোন বিষয় নয়। একটু দুঃসাহসিক, বেপরোয়া হতে হয়, 'ন্যাকা' লোকের কর্ম নয়, আমাকে শেখাস না আমি সোশিওলজির ছাত্রী, পথে ঘাটে কুকুর-কুকুরি···কখনও কি মনে হয়নি আমরা মানুষ বলে খুব একটা কিছু আলাদা নয়। যাই হোক মনে কষ্ট দিয়ে জীবনের অন্যান্য প্রাপ্তিগুলোকে খোয়াবার কোন মানে হয় না।'

যুদ্ধ কোন নতুন ঘটনা নয়, ছিল, আছে···এই বস্তুপৃথিবীতে শাসক বা শোষিত শ্রেণীর যে কোন লক্ষ্যই কার্যকরী করা, যে কোন মূল্যে, আমরা মানুষেরা ধ্বংস করার পূর্ণক্ষমতাকে আরোপ করিতে বদ্ধপরিকর! আমরা এগিয়ে চলেছি!

আপনি আছেন, আপনার সত্বায়, বৈশিষ্ট্যে সর্বদাই যেমত, যেমনটি ভাবা হয়ে থাকে সেমত হয়ত নয় অথবা হয়ত···এবং অতিবাহিত সময়ে আপনি, আপনার অবস্থানকে কেন্দ্র করে, সংশয়ে হয়ত কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, প্রকাশ থাকুক এ সময় সীমায় 'পাগল' আখ্যানমূলক ভয়ঙ্কর জীবনলিপি অপেক্ষমান।

বিশ্ব চল দুপুর-দুপুর বেরিয়ে পড়ি, ঝলমলে রোদ্দুর, চল যাই ঘরের বাইরে, ঘর ও বাইরের ভাবপ্রকাশ সচেতন মাত্রেই উপলব্ধি করেছেন।

দূরত্ব—ময়দান, কলকাতা—৩০০, কুচকাওয়াজ, উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ, জীবন যেরকম—আনন্দ অথবা দুর্বিষহ উভয়ই বর্তমান।

'অপরাধমূলক গেঞ্জি পরে জয়দীপ সান্যাল ওরফে খোকন পার্ক স্ট্রিটের নাভিতে পা রাখল। লরেটো-কিশোরীদের সান্ধ্য-চিতাবাঘ হয়ে বেরিয়ে এল তার হোণ্ডা মোটরবাইক ওনিডা টিভির পর্দা ফুঁড়ে হাতে-হাতে উঠে এল থামস-আপ, তামাম চৌরঙ্গী তখন নিওন আলোর বাবলগাম। উজ্জ্বল পার্ক স্ট্রিট তখন হিপ পকেটে চে-র ডাইরির সুদৃশ্য পেপারব্যাক। এ-ও এক বাস্তবতা গর্ভিনী পরিচারিকার হাতে ফরাসি সেন্টের শিশির মতো।

বলা বাহুল্য খোকন এবং খোকনের পর্যবেক্ষক দুজনেই গিনিপিগ। এই দুজনকে যে লক্ষ করছে ওনিডা টিভির শয়তান—সেও গিনিপিগ।

খোলা আকাশের নীচে চলছে মনোবিজ্ঞানীদের লাগাতার কুইজ কনটেস্ট। 'খোকন বাড়ি ফিরতে রাত করিস না বাবা'—এই উক্তিটি কার ?'

তার সেই বিরল হাসি আমাকে মুগ্ধ করেছিল, মানুষের স্বভাবসুলভ স্রোতের প্রতিই আমি আগ্রহী। আমার কোন দক্ষতা নেই। কোন কিছু প্রাপ্তির বিনিময়ে নিজেকে ব্যবহার করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণ। আমার সমস্যার কথা জানতে চাওয়া হলে বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় ; ভাবা হয়নি কখনও যে কারণে আমি কখন কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে পারিনি···তাদের সমস্যায় জর্জরিত, সমস্যার গল্পে, বিজ্ঞাপনে আন্দোলনের নানারকম কর্মসূচিতে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা—এমন কি ভাবা আমার ক্ষেত্রে অসম্ভব প্রায় !

গোটা শরীর আগুন নিয়েও বধূটি নিজেকে রক্ষা করার জন্য ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন কিন্তু না তাঁর প্রাণ গিয়েছে। পুরুষটি নির্বিকার। হয়ত নয়, হয়ত বা যে তিনি, পুরুষটি অক্ষম, সন্দেহপ্রবণ—তাঁদের একমাত্র সন্তানের জন্মকেও অস্বীকার করেছিলেন।

হয়ত বা এভাবেই আমাদের আপলিফটমেণ্ট হচ্ছে, ঘটনা পরম্পরায়, জটিল জীবন-যন্ত্রণায়।

১৩ মার্চ। আজ ৩৩টি জন্মদিন শেষে আরও একবার জন্মদিনের প্রসঙ্গে বলি, আমার মতো এক মদ্যপ, হতাশাগ্রস্ত সন্তানকেও জন্ম দিতে হয়েছিল ! জন্মদিনে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি, হায় জন্মদিন উদযাপন !

বেঁচে আছি—এ বোধ ক্রমশ আমাকে আক্রান্ত করে বরং আমার মৃত্যু হয়েছে এ ভাবনা আমাকে তৃপ্ত করে।

....

বড় বেশিরকমের আঁধার করে আছে। এই শীত বাতাস, যেন কোথাও প্রত্যাশা রয়ে গেছে। যদি বা বলি সে ইচ্ছা। এখানে প্রাপ্তিযোগের বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকে।

ছেলেটা চৌহদ্দির বাইরে···
চলে গিয়েছে ছেলেটা
চৌহদ্দির বাইরে
বাইরে···

বিমল চট্টোপাধ্যায়

....

খেলাস্মরণ

১ ঃ উন্মাদের শব্দ ॥

লেখার ছায়ার নীচে লুকিয়ে পড়তে চাই, স্বপ্ন প্রেম আর নির্যাতনের আচরণ আমাকে ডাকে। চারদিকে কীর্তির চিহ্ন, চেঁছে নেওয়া মুখ, আঘাতের লাভ। ক্ষতি লাভ হয়ে ওঠে, উঠছে, ছুঁয়ে দিলেই সব এঁকেবেঁকে যায়, তখনই কথা, কত কথা, মন্থর থেকে দ্রুত, আবার উল্টোটা, ফিসফিসে ভয়, ঝড় মনে হয়, ঝড় উঠছে, ভয়ে গুটিয়ে যাই।

আত্মঘাতী ভাষা সিঁড়ি দিয়ে নামে ভয়ে নষ্ট করি সব, হাত ফাঁকা হলে আগুনের মধ্যে দিয়ে পালানোর পথ চোখে পড়ে, নেই আড়াল, নেই ভ্রমণ।

নাক উঁচু করে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, দাঁত চেপে ঠোঁট ফাঁক করে রাগ মিশিয়ে ছুঁয়ে দিই ছবি, ওরা ছবির আড়াল দেখতে চায়। কী দেখাবে ওরা ?

ভাসতে ভাসতে ঘুম, ঘুমের ফাঁকে-ফাঁকে ঝুলে থাকা অন্ধকার, অন্ধকার কাজ করে, 'বোধ কাকে বলে ?' আমার ওসব নেই, নেই তাই ছটফটানি, কী করে সাজিয়ে তুলব ? আছে, আছে, একটা ছুটো স্বপ্ন।

কাছে এসো তুমি, উদ্বেগ ধ্বনি উদ্ধার সব একাকার করে নিই। ছায়া হয়ে ওঠে ঝরণা, শব্দ শুনতে পাই, মৃত্যুমুখি উন্মাদের শব্দ। সে বা তারা আছে, আছে মাঠে ঘাটে মৃত্যুর মতো অমর।

কাগজে আমি এইসব লিখে ফেলেছি। ভিজে জবজব করছে পাতলা কাগজ। বড় চাপ গেছে। বুকের কাছে ছেঁড়া, ঝড় উঠছে, উঠলেই উড়ে যাবে সব।

২ ঃ খেলাস্মরণ ॥

উৎসবের ধাক্কা খেয়ে শিকড়ের কাছে নামতে চাইছি। খেলাস্মরণের ছবি গরম বাষ্পে গলে উতলা হয়ে উঠছে। ওদের মন নেই ঠোঁট নেই, বোবা, হাল্কা, ভারী ভারী শব্দের নীচে চাপা পড়ে যন্ত্রণায় কাতরায়।

রাজনীতির কারণে যে বিপর্যয় ভাষাকে চায়, ভাষা কি এক উজ্জ্বল ফাঁদ? শিশুটিকে এগিয়ে এসে ধরা দিতে হল, কসাই পিতামাতা জ্ঞান নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে, শুরু হয় পরিচয়। পরিচয় মানে চাবুক, চাবুকের আঘাত, আঘাতের চমক, সেই হাতে খড়ির দিনে।

আমি ছুঁচ হয়ে তোমার ছেঁড়াফাটা সারিয়ে তুলব, এই দৃশ্যে তুমি নড়াচড়া করোনা, আমি আসলে খুবই কোমল, ফোঁটা ফোঁটা কোমল রক্ত, পিচের রাস্তায় কিছুক্ষণ, গতির মুখে উধাও।

গঠন মানেই হানাহানি। পীড়নের ভোঁতা মুখের দিকে চেয়ে হাসি আসে, যত উচ্ছ্বাস ওই ওদেরই আছে।

বল না সম্পর্কের কথা, থাক যত ভয়, ক্ষয়, মানুষের ব্যবহারের বাড়ি ভূমিকম্পে উল্টে গেছে।

রাজনৈতিক খুনখারাবির দিনে যাদের জন্ম হল তারা আমার সুহৃদ, তারা জানে ঋতু, বোঝে ইতিহাস, তাদের মুখ জড়াজড়ি করি, এই ষড়যন্ত্র তারা ধ্বংস করবে, শুধু আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে হবে। □

Space donated by :

Sree Nishit Chandra Ghosh

রাহুল পুরকায়স্থ

....

কপিকল অথবা হাওয়া-মোরগ

সেলুনের থেকে তবে শুরু হোক নতুন সমাজ, কাঁচির আওয়াজ, ছুরির বাত্যাবিনিময়, খুরের সন্ত্রাস, মৃদু সংসদীয়। এরই মাঝে, এভ বেই ঘুম ভাঙে। একইভাবে। রোজ। রোজই মনে করতে চাই গত মুহূর্তের শেষ রাত্রি, দ্রুত শ্বাসাঘাতের সাথে তাল মিলিয়ে ঠিক কতবার হিক্কা তুলেছিলেন মোহনদাস। দেখি পত্‌পত্‌ উড়িতেছে জাতীয় পতাকা, চশমার ঘষা কাঁচ ভেদিয়া দেখিতেছেন আমাদের পিতামহ। দেখিতেছেন ১৫ অগাস্ট '৪৭, সাপুড়ে গিলিতেছে সাপিনীর মাথা আর মাউন্টব্যাটেন।

এই ভোর। এই জেগে ওঠা। কখনও গর্জন, কখনও কুটি কুটি ছিঁড়ে ফেলা আত্মাভিমান, প্রবঞ্চনা—অসহ্য! ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুরনো হরফ, ফিরিয়ে দিচ্ছে অবসাদ আর ঈর্ষা। রক্ত আর পুঁজ আর উঠোন-উঠোন বমি। চারদিকে কাঁচির শব্দ আর ঘুম। দিব্যঘুম।

আজ হতে অনেক অনেক আগে আমাদের রক্ত, অস্থি মন্থন করেছিল যারা—তাঁরা আজ আমাদের বাড়িওয়ালার ভাইবোন। প্রতিনিয়তই তাঁরা ছুড়ে দিচ্ছেন যাবতীয় উচ্ছ্বাস ও উচ্ছিষ্ট আর আমরা লেজ তুলে ছুটে যাচ্ছি দোতলা তিনতলায়।

আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যবর্তী দরজা দুলে ওঠে। জলের গভীরে দোলে শামুকের মাথা, সভ্যতার ধারাবিবরণ। বিবর্তনের শেষ ধাপ বলে কিছুই নেই—এই শব্দকটি বারবার ছিঁড়ে ফেলে উহাদের দাঁত। আমার বমি পায়। আরও অগ্নিকাণ্ডের পর ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেল আটটি ছাপার কল। অক্ষত অস্তিত্ব। আগুন-খেকো। পরিশুদ্ধ! সব্জিআলার মেয়ে পালিয়েছে গতরাতে। সাথে আছে মিল-ম্যানেজার, হবে জয়!

ব্যাঙ্কের বই বলে কিছু নেই যার তার আছে লক্ষ্মীর ঘট। আরামকেদারার ছেঁড়া কাপড়ের থেকে প্রতিদিন বেঁচে ওঠে ইঁদুরের খোকা (খোকা হোক! খোকা হোক!) অন্ধবিন্দুর থেকে ছুটে আসা হাওয়া এইসব ঘিরে রাখে। রোজ।

শ্রমিক-কল্যাণ কেন্দ্রের দিকে যেতে যেতে টের পাই ভাষা বিনিময়। আমাদের বাড়ির পাশে আত্মহত্যাপ্রবণ যে মানুষ তিনিও শ্রমিক, ৭ মাস বন্ধ কলের। শ্রমিক-কল্যাণ! (তুমি কি দেখেছ তাঁকে? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে?)

হাওয়া দেয়। ভীষণ ভীষণ জোরে। লাট খায় শৃঙ্খলা, গূঢ় অভিমান, লাট খায় বিনিয়োগ, যৌথ খামার। ছুটে যায় দমকল। আগুন লেগেছে ওই চালে। চিমনির গলা চাটে ধাড়ি আমলারা।

এই শেষ, এই শুরু, অকাল বোধন। □

Manufacturers & Exporters of :

Helical Fittings, Pole Line Hardware, Trans & Dist Structures. Overhead Line Accessories, Insulator Hardware, Clamps & Connectors, Line Conductor Accessories.

MODERN MALLEABLE CASTING WORKS LTD.

53-B, MIRZA GHALIB STREET,
CALCUTTA-700 016.
Phone : 294904, 295268, 291126, 297027
Fax : (033) 292765
Telex : 021-5826 MMW IN
Cable : MALLECAST

তা র কো ভ স্কি

জঁা পল সার্ত্র 'ইভানস চাইল্ডহুড' দেখে 'সোস্যালিস্ট স্যুররিয়ালিস্ট' অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন তাঁকে, বার্গম্যান বলেছিলেন, ফিল্মের যথার্থ প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকে উঠে এসেছে তাঁর ভাষা। এই ভাষা তিনি আবিষ্কার করেছেন। 'সোলারিস' দেখে অভিভূত এক ইতিহাসবেত্তা বলেছেন এ ছবি 'চিন্তার সমুদ্র'। আন্দ্রেই আর্সেনইয়েভিচ তারকোভস্কির চলচ্চিত্র ও তাঁর রচনা এই সংখ্যায় আমাদের প্রসঙ্গ। আলোচকরা প্রত্যেকেই বিশেষ জোর দিয়েছেন 'স্যাক্রিফাইস' ছবিটির উপর। ফলে বেশ কিছু পুনরুক্তি ও পুনরুল্লেখ দোষ আছে। সব কটি ছবি অনেকবার না দেখতে পারাও এর অন্যতম কারণ। আবার তারকোভস্কির ছবিতে আত্মিক সংকট ও উত্তরণের শীর্ষবিন্দু সর্বদাই এক। বৈচিত্র ও বিভিন্নতা এখানে অনুভবের বিষয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী □ ১৯৩২—জন্ম মস্কো শহরে। পিতা বিখ্যাত রুশ কবি আর্সেনি তারকোভস্কি। ১৯৫২—প্রাচ্যভাষা শিক্ষা কেন্দ্রে যোগদান, আরবি ভাষা নিয়ে পড়াশুনো। ১৯৫৬—অল্ ইউনিয়ন স্টেট সিনেমাটোগ্রাফ ইনস্টিটিউটে যোগদান। ১৯৫৯—'দেয়ার উইল বি নো লিভ টুডে' (ডিপ্লোমা ছবি)। ১৯৬০—'দি স্টিম রোলার অ্যাণ্ড দি ভায়োলিন' (ডিপ্লোমা ছবি)। ১৯৬১—'ইভানস চাইল্ডহুড'। ১৯৬৫—'আন্দ্রে রুবলভ'। ১৯৭১—'সোলারিস'। ১৯৭৫—'মিরর'। ১৯৭৯—'স্টকার'। সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ। ১৯৮৩—'নস্টালজিয়া' (ইতালিতে নির্মিত) ১৯৮৫—'স্যাক্রিফাইস' (সুইডেনে নির্মিত) ১৯৮৬, ২৮ ডিসেম্বর—মৃত্যু।

সিদ্ধার্থ সেন

....

সময়-স্মৃতি-স্বপ্ন ঃ আন্দ্রেই তারকোভস্কির চলচ্চিত্র

গল্পটা এরকম হতে পারত··· । গল্পের নায়ক আলেকজাণ্ডার, মরণোন্মুখ—মারাত্মক ক্যান্সারে আক্রান্ত। দিনের পর দিন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে-শুনতে, মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে একদিন সত্যিসত্যিই দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজার সামনে এক রহস্যময় ডাকপিয়ন অদ্ভুত এক বার্তা নিয়ে হাজির। আলেকজাণ্ডারকে এক মায়াবী নারীর শয্যাসঙ্গী হতে হবে সেই রাতেই—লোকে তাকে ডাইনি বলে জানে। এ ছাড়া, আলেকজাণ্ডারের নাকি পরিত্রাণ নেই—মৃত্যু তার অবধারিত। আশ্চর্য সেই রাতে মায়াবিনীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল আলেকজাণ্ডার। ভবিষ্যতে সেই নারীর যে কোন আদেশ যে কোন মূল্যে শিরোধার্য হবে—এইরকম বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হল। ভোর হয়ে এলে ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে আলেকজাণ্ডার আবিষ্কার করল তার অসুখ সেরে গিয়েছে। বাড়িতে ফিরে এলে ডাক্তার আলেকজাণ্ডারকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বলে ঘোষণা করল। নতুন পৃথিবীতে নতুন করে যখন তার জীবন শুরু ঠিক তখনই একদিন দরজায় আবার ঘণ্টা বেজে ওঠে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই নারী। মুহূর্তের আদেশে মায়াবিনীর সঙ্গে আলেকজাণ্ডার ছেড়ে চলে গেল তার এতদিনের সংসার। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, প্রাসাদোপম অট্টালিকা আর ধনসম্পদ। কাঁধে তার বহুদিনের পুরনো একটা কোট।

ধু ধু করা জীবনের এক অচেনা প্রান্তরে অজানা নিরুদ্দেশ যাত্রা তার পেছনের সব কিছু ফেলে দিয়ে, তবু এক তীব্র আনন্দ, অদ্ভুত সুখে পরিপূর্ণ হয়ে গেল তার মন এই সর্বস্ব আত্মদানে। এই ছিল আন্দ্রেই তারকোভস্কির অসাধারণ চলচ্চিত্র 'আত্মদান' ('স্যাক্রিফাইস') এর প্রথম খসড়া। শুধু চলচ্চিত্রের খসড়াই নয়, তারকোভস্কির একান্ত, নিজস্ব অন্তর্জগতের একটুকরো নকশা ধরা পড়ে যায় এই খসড়ায়—যা আপামর ভোগসর্বস্ব, যন্ত্রপীড়িত আমাদের এই আধুনিক সভ্যতার সর্বব্যাপ্ত ভোগবিকারকে প্রবল অনীহায় খারিজ করতে চায়। আর খারিজ করে দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগও গ্রহণীয়। তাই প্রকৃতির কাছে (প্রতীকীভাবে নারীর কাছে) সেই সর্বস্ব ত্যাগের, আত্মদানের তীব্র সুখ বহন করে চলে তারকোভস্কির শিল্পজগৎ।

ভোগসর্বস্বতার প্রতি প্রবল অনীহার শিল্পরূপ অনেক দেশেই অনেক সময়ে নিজস্ব ধারায় প্রবহমান—তার একান্ত রুশীয় চেহারা ডস্টয়েভস্কি কিংবা তলস্তয়ের গল্প উপন্যাসে খুব প্রবল ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সন্দেহ নেই, তারকোভস্কি ছিলেন বরাবরই ডস্টয়েভস্কির প্রবল অনুরাগী। ডস্টয়েভস্কির 'ইডিয়ট' নিয়ে ছবি করবার বাসনা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই পরিকল্পনা পরে পরিত্যক্ত হয় এই ভেবে যে শুধু একটি উপন্যাস নিয়ে ছবি করলে ডস্টয়েভস্কির বিশাল মানসিক জগতের একটা সামান্য অংশই কেবল ধরতে পারা যাবে। অতএব প্রয়োজন গোটা ডস্টয়েভস্কিকে নিয়ে ও তাঁর সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম নিয়ে ছবি করা। তলস্তয়ের 'ইভান ইলিচের মৃত্যু'ও ছিল তারকোভস্কির অত্যন্ত প্রিয় এবং তাঁর ছবি করার অসম্পূর্ণ পরিকল্পনার অন্তর্গত। কিন্তু তারকোভস্কির মানসিক জগত আরো জটিল এবং বিচিত্র, বহুস্তরবিশিষ্ট যা 'সিনেমা'—এই বিশেষ শিল্পরূপটির আধুনিক পরিব্যাপ্তির এবং অন্তর্মুখিনতার বৈশিষ্ট্য বহন করে চলে।

কিন্তু কেন এই ভোগসর্বস্বতার প্রতি প্রবল অনীহায় মর্ষকামী এক আত্মদানের আত্মধ্বংসী আত্মমন্থন যা সমুদ্রমন্থনের মতনই তাঁর সৃষ্টিজগতকে তোলপাড় করে তুলেছে। শুধু 'স্যাক্রিফাইসেই' নয় 'নস্টালজিয়া' এবং অনেক অংশে 'আন্দ্রে রুব্‌লভেও' প্রকট হয়ে আছে এই আত্মধ্বংসী মন্থন। একি শুধুই খৃষ্টীয় আত্মদানের প্যাশন প্লে ? নাকি আজকের মানসদর্পণে যন্ত্রসভ্যতার ঊষর মরুভূমির আকাশ বাতাস কাঁপানো এক হাহাকার, দৃষ্টিহীনের দেশে হারিয়ে যাওয়া নির্জন এক চক্ষুষ্মানের নতুন করে মাটি আর আর আকাশের রঙের খেলা আর মানুষের হৃদয়ের আলো চিনে নেবার আকুল আর্তি ? কিন্তু কী করে মানুষ মানুষের সন্ধান পাবে। যন্ত্রপীড়িত সমাজের পণ্যসর্বস্বতার

প্রবল শাসনে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্রও পণ্যে পরিণত। মিডিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপ চলছে সেখানে।

অথচ শুধু আলাপে, শুধু কথায়-কথায় একদিন মানুষের যোগসূত্র ঘটত। শব্দ ছিল সত্য। শব্দ ব্রহ্ম। তাই স্যাক্রিফাইস ছবির গোড়ায় আলেকজাণ্ডার বলে 'ইন দি বিগনিং দেয়ার ওয়াজ দি ওয়ার্ড।' কিন্তু কালক্রমে শব্দ তার মহিমা হারায়। কথাশিল্পে জড়িয়ে থাকে ভানভণিতার বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রকরণ। কথার মায়ায় জড়িয়ে পড়ে 'কথা'। বাক্যই হয়ে দাঁড়ায় বাস্তব এবং নকল বাস্তবের সঙ্গে, নকল ছায়ার সঙ্গে কুস্তিবাজির অবলম্বন।

কথার জোরে হয়কে নয় শুধু নয়, কথার দাস বানিয়ে মানুষকে করা যায় কলের পুতুল। যেন এইরকম কথার সঙ্গেই না জেনে আড়ি করে থাকে আলেকজাণ্ডারের ছেলে (আসলে তারকোভস্কির সবচেয়ে ছোট ছেলের প্রতিরূপ—যাকে ছাড়া নির্জন প্রবাসে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তারকোভস্কির জীবনযাপন)। ছোট্ট ছেলেটির গলায় একটা অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তাই তার কথা বলা বারণ। আলেকজাণ্ডার কিন্তু কথা বলে চলে। শুধু কথা, অনেক কথা। থিয়েটারের নাম করা লোক ছিল একসময়ে অতএব কথাতো তার অবলম্বন হবেই। এইখানে সিনেমার শিল্পরূপেরও একটা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা রয়ে গেছে। এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিল্পরূপ হিসাবে সিনেমা 'কথাকে' অতিক্রম করে যায়। শুধু শব্দ আর দৃশ্যের মিলনেই সিনেমা নয়। তাহলে তো শুধু কথাশিল্প অথবা চিত্রশিল্প দিয়েই সিনেমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে ফেলা যায়। শুধু চোখ ভরে দেখা আর কান ভরে শোনা অতিক্রম করে সিনেমা এক নিজস্ব অনুভূতির জগতে নিয়ে যায় আমাদের, যেখানে বর্ণনা, দৃশ্য বা শ্রুতি কোনটা দিয়েই তাকে ধরে রাখা যেতে পারে না। ভাষার যে নিজস্ব রূপ এবং জগৎ আছে সেখানে চলে অবিরত নির্মাণকার্য; ব্যাকরণ কিংবা লোকপ্রচলিত ব্যবহার দিয়ে। জগৎ বা প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে ওঠে ভাষার মারফত তার ওপর ভাষার জগতের নির্মাণকার্যের নিজস্ব কারিকুরি আছে, আছে তার নিঃশব্দ খবরদারি। ফলে ভাষার কারুকার্য এবং ওই কারুকর্ম প্রভাবিত মননের ধারাতেও বাস্তব সম্পর্কিত ধারণার বিকার ঘটে চলে অনবরত—কিন্তু এত স্বাভাবিক ভাবে যে সেটাই মনে হয় অনিবার্যভাবে গ্রহণযোগ্য। স্থিরচিত্র বা চিত্রশিল্পেরও একইরকম একটা মজার ব্যাপার আছে।

সেখানে এক বিশেষ মুহূর্তের এক বিশেষ রূপ উদগ্র হয়ে ওঠে, যেন সময়ের ঘড়ি থমকে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওই বিশেষ ক্ষণটিই একমাত্র সত্য যা শাশ্বত

হয়ে ওঠবার চেষ্টায় ব্যাকুল। এখানে সময়প্রবাহের বিকার ঘটে চলে অনবরত এবং জেনে শুনেও সেই বিকার গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে কেননা বড় মোহময়, বড় সুন্দর এই কালবিকৃতি, যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে ওই বিশেষ শিল্পের সাফল্য।

কিন্তু ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ে যাওয়া চলমান বাস্তব চলচ্চিত্রে হাজির হয় প্রকৃতির রঙঢঙের বহুবিচিত্র, বহু স্তর বিশিষ্ট নানা সম্ভাবনা নিয়ে। সময়প্রবাহের উপর ভর দিয়ে বাস্তব কিংবা প্রকৃতির বিচিত্র রূপবর্ণময়তা তার রহস্যের পাখা মেলতে পারে পুরোদমে একমাত্র এই 'সিনেমা' নামক শিল্পরূপটিতেই।

অতএব বাস্তবের অনেক বেশি সত্য অনেক বেশি করে আত্মপ্রকাশ করতে পারে চলচ্চিত্রে (এবং অতএব, একইসঙ্গে বাস্তবের অনেক বেশি বিকৃতি অনেক বেশি মনোগ্রাহী 'মিথ্যার'ও জোরাল অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে এই সিনেমা)।

তাহলে আমরা 'কথা'য় ফিরে যাই আবার। সেই নির্ভেজাল আদিকথা যা দিয়ে সত্যিকারের যোগসূত্র রচিত হত একসময়, আমাদের এই পণ্যসভ্যতার আগে। এই 'কথা' দিয়েই উচ্চারিত হত মন্ত্র, প্রার্থনা। আমরা আজকাল প্রার্থনা করতেও ভুলে গেছি। অথচ রোজ একই সময় যদি অভ্যাসবশতঃ এবং শ্রদ্ধাসহকারে কোন নিয়মিত কার্যপদ্ধতি নেওয়া যায় এবং তার সঙ্গে যদি উচ্চারিত হয় কোন প্রার্থনা তবে সে প্রার্থনা সফল হবেই। এখানে সেই গল্পটার উল্লেখ আছে। এক পাতাবিহীন মরা গাছ পুঁতে দেওয়া হয়েছিল পাথুরে পাহাড়ের ওপর। কাছাকাছি ছিল একটা আশ্রম। সেখানকার এক ব্রহ্মচারী নিয়মিত সেই মরা গাছটার গোড়ায় জল দিত আর প্রার্থনা করত যেন তার প্রাণসঞ্চার হয়। রোজ একইভাবে চলত সেই কাজ। তারপরে সত্যিসত্যিই একদিন দেখা গেল পাতায় ভর্তি সজীব সেই গাছটা ডালপালা মেলে ধরেছে আকাশের দিকে। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধিপরিচালিত মোহান্ধ আজকের মানুষ ওসব বেমালুম ভুলে গিয়েছে। তাই এত অশান্তি। ভোগের বিকট প্রাচুর্যের ভিতরেও ঘরে-ঘরে উন্মাদনা, অসহনীয় জীবনযাপন। জীবনের সব আনন্দ, সব ভালবাসা যেন মুছে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে, বেঁচে থাকাই অর্থহীন। তারই এক বিকট উদাহরণ অ্যাডিলেড, আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী। নিজের স্বার্থ ছাড়া সে কিচ্ছু বোঝে না। অন্যের প্রয়োজন, অন্যের ভাল তার ধারণার মধ্যেই নেই। ফলে পৃথিবীর সঙ্গে তার সমঝোতার অভাব ঘটে অহরহ। আর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু

হয়ে যায় তার ভয়ংকর হিস্টিরিয়া। অ্যাডিলেডের বিপরীত বিন্দুতে আছে পরিচারিকা মারিয়া। ভারী সুন্দর তার স্বভাব। মৃদুভাষী এবং সহমর্মী এই মহিলাটির সঙ্গে কিন্তু প্রথমদিকে ভাল করে আলাপও হয়নি আলেকজাণ্ডারের। অ্যাডিলেডকে সামাল দিতেই মনের দিক থেকে সব খরচ হয়ে যায় তার। আলেকজাণ্ডারের বেঁচে থাকার একমাত্র আশার আলো তার ছোট ছেলে—যাকে আদর করে ডাকা হয় 'লিটল ম্যান'। কিন্তু মোহান্ধ ভোগসর্বস্বতার অসহনীয় জীবনযাত্রা থেকে কী করে মুক্তি পাবে মানুষ? আসলে প্রাচুর্যের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া আজকের মানুষ বড্ড ভোগবিলাসী, বড্ড আরামপ্রিয়। পণ্যজগতের বাইরে কিছু পেতে হলে হৃদয় থেকে দিতে হয় অনেককিছু এটা স্বীকার করতে সে রাজি নয়। কিন্তু আলেকজাণ্ডার রাজি—এমনকী চরম আত্মদানেও। কেননা স্বার্থান্ধতার অসহনীয় চেহারা তার বেঁচে থাকা আর না থাকাকে সমান করে তুলেছে। কিংবা আসলে সে বেঁচেই নেই, চরম আত্মদানের ভেতর দিয়ে অন্তত বাঁচার একটা অর্থ সে খুঁজে পেতে চায়—যা পণ্যসর্বস্বতার "স্বাভাবিক" সমাজের কাছে শুধু 'অস্বাভাবিকতাই' নয় চূড়ান্ত পাগলামি।

অর্থাৎ 'সভ্যতার সংকট'। কিন্তু গোটা 'সভ্যতার সংকট'কে তো একটা ব্যক্তি মানুষের রোগমুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় না—তার বিশালতা ধরা পড়বে না তাহলে। অতএব আলেকজাণ্ডারের রোগমুক্তি নয়, (যা প্রথম খসড়ায় ছিল) গোটা সমাজ-সভ্যতার রোগমুক্তির জন্য চাই ব্যক্তি মানুষের আত্মদান। আর স্বার্থান্ধ সমাজের ক্যান্সারের তুলনায় আসল ছবিতে তাই এল ভয়ংকর এক বিধ্বংসী নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের কল্পনা। তার থেকে পালানোর পথ নেই কারুর। আলো নিভে যায়। রেডিও, টিভি বিকল হতে থাকে।

অ্যাডিলেডের হিস্টিরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিবেশ যেন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্তি কোথায়? সময়ের জটিল আবর্তে থমকে দাঁড়ান মানুষ প্রায়শই পথ খোঁজার জন্যে চলে যায় স্বপ্নের ভিতরে। মানুষের স্বপ্ন আর স্মৃতি অস্তিত্বের রঙ রূপ হৃদয় খুঁড়ে আবিষ্কার করতে চায়, সামনের জটিল সময়ের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে বলে। আলেকজাণ্ডারও স্বপ্ন দেখেছিল। ভয়ংকর সেই স্বপ্ন, যাতে ছিল অন্তিম বিপদের সংকেত। বিশাল এক চত্বর দিয়ে অসংখ্য ভয়ার্ত, প্রায় নগ্ন নরনারী ছুটে পালাচ্ছে অদ্ভুত জটিল কিন্তু মসৃণ গতিপথে। নিউক্লিয়ার হলোকাস্ট? উল্টে পড়ে আছে রঙ চটা পুরনো গাড়ির ধ্বংসাবশেষ—ছেঁড়া টায়ার। অন্ধ টেকনোলজির নির্জন পোড়ো জমিতে টপ্ টপ্ করে নোংরা জল পড়েই যাচ্ছে। শাদাকালোর আঁচড়ে

ক্যামেরায় আঁকা অদ্ভুত ভয়ংকর এই স্বপ্নদৃশ্য সিনেমার ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকে।

বিপদের আভাস পাওয়া গিয়েছিল আরো একবার যখন এক উড়ো জাহাজ বিকট গর্জনে কাঁপিয়ে দেয় ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র উল্টে যায়, দুধের জগ আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে আর পা পিছলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে অটো নামের ডাক পিয়ন। অটো এসেছিল আলেকজাণ্ডারের জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে। জন্মদিনের একটা অদ্ভুত উপহার এনেছিল—পুরনো ইউরোপের মানচিত্র যার সঙ্গে আসল মানচিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। রাজা রাজরাদের যুদ্ধ বিগ্রহে, অত্যাচারে বার বার ভাগ হয়েছে রক্তাপ্লুত নানা দেশের ছবি। স্বার্থ পরিচালিত সেই ভাগকে যেন অস্বীকার করেই এই কাল্পনিক মানচিত্র। শুধু মানচিত্র নয়। অদ্ভুত সব ঘটনাবলীরও অ্যালবাম রাখে অটো। তার সংগ্রহশালার অদ্ভুত গল্প আছে একটা। যুদ্ধের সময়ে মায়ের একমাত্র ছেলে মারা গিয়েছিল। ছেলেটার একমাত্র স্মৃতি ছিল একটা মাত্র ফটোগ্রাফ যা হারিয়ে যায়। অনেকবছর পরে মা গিয়েছে একটা স্টুডিওতে ছবি তুলতে তার বন্ধুকে উপহার দেবে বলে। কিন্তু ছবিটা যখন পাওয়া গেল, চমকে উঠল মা। এটাতো তার স্টুডিওতে তোলা ছবি নয়। ছবিতে উঁকি মারছে তার ছেলে, ঠিক যুদ্ধে যাওয়ার সময়কার ছবি। আর পাশে বসা মায়ের বয়স কমে গেছে অনেক। সেই একই সময়কার তরুণী মায়ের ছবি, যখন ছেলে যুদ্ধে গিয়েছিল।

স্মৃতি এবং স্বপ্নের এই মায়াবী জাদু বারে বারেই তারকোভস্কির নানা ছবিতে ঘুরে ফিরে আসে।

'নস্টালজিয়া'র নায়ক আন্দ্রেই, ইটালিতে গিয়েছে এক রাশিয়ান সঙ্গীত স্রষ্টার জীবন সম্পর্কিত গবেষণায়, যার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় ইটালিতে। সঙ্গিনী ইউজেনিয়াকে নিয়ে আন্দ্রেই গিয়েছিল এক তীর্থস্থানে, যেখানে নিঃসন্তান নারীরা সন্তান কামনায় প্রার্থনা করতে আসে ভার্জিন মেরির কাছে। চারজন মেয়ে পর্দা ঢাকা ভার্জিন মেরির ভারী মূর্তি বহন করে আনে। কিন্তু পর্দা খুলে যেতেই অবাক কাণ্ড। এক ঝাঁক পাখি ভার্জিন মেরির বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আকাশে ছড়িয়ে পড়তেই শাদা বরফের মতন তাদের পালক ঝরে ঝরে পড়ে। সেপিয়া রঙের এক স্বপ্নদৃশ্যে দেখা যায় আন্দ্রেই ওই বরফ ঝরে পড়ার মতন ঝরে পড়া শাদা পালক সযত্নে তুলে নিচ্ছে মাটি আর কাদা থেকে। স্বপ্নের ভিতরে ওই পাখি বা পালক ঘুরে ফিরে আসে। আরেকটা স্বপ্নদৃশ্যে

দেখা যায় শোবার ঘর, নারী ও পালঙ্ক, অন্যকোন জায়গার সুখস্মৃতি আর জানালার তাকে মরা পাখি।

হঠাৎ সেই পালঙ্ক স্থান পরিবর্তন করে। বর্ণহীন এক দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই পালঙ্কে শোয়া এক প্রসূতি, আন্দ্রেইর স্ত্রী অথবা মা। কিংবা ডমিনিকোর স্বপ্নের নিসর্গদৃশ্য তার জানলা খুলে ইটালির পাহাড় হয়ে বাইরে মিশে যায়, বা ছবির শেষ দিকে রুশ সঙ্গীতের তালে তালে স্বপ্নের সরোবরের কাছে দাঁড়ানো অন্যকোন জায়গার সুখস্মৃতি। আন্দ্রেইর কাঠের বাড়ি একটা ছোট্ট থিয়েটারের স্টেজের মতন হয়ে গিয়ে বিশাল ক্যাথিড্রালের ভগ্নাবশেষের ভিতর ঢুকে যায়। গীর্জার চত্বরে ঘাসের ওপর আন্দ্রেইর অস্থির পদক্ষেপ আর গীর্জার ভিতর সেণ্ট ক্যাথারিন এবং ঈশ্বরের দৈব কথোপকথনে জানা গেল সেণ্ট ক্যাথারিনের আকুল প্রার্থনা, মানুষের ভিতরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যেন উপলব্ধি ঘটে। ঈর্শ্বরের বাণী শোনা যায় 'মানুষকে তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে, নিজের সচেতনতায় আস্থা রেখে'।

তারকোভস্কির কাছে সময়ের ধারণা মানুষের স্মৃতি আর স্বপ্নের সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। কালপ্রবাহে মানুষের অস্তিত্বের অবলম্বন এই স্মৃতি। যা বর্তমান তা তো ক্ষণস্থায়ী। জলের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া নুড়ির চাঞ্চল্য যেমন অপস্রয়মান জলের তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই মুছে যায় তেমনি পলকা এবং অনির্দেশ্য এই ক্ষণস্থায়ী বর্তমান। কিন্তু যেই 'বর্তমান' অতীতে চলে যায়, কালপ্রবাহে তার ছাপ রেখে দিয়ে যায় মানুষের স্মৃতিতে—যাকে তারকোভস্কি বলেছেন 'ইমপ্রিণ্টেড টাইম' তখনই তার কালজয়ী ব্যাপ্তি ঘটে। স্মৃতির এই সঞ্চার, স্বপ্নের মধ্যেই তার তীব্রতম অভিনিবেশ, সময়প্রবাহকে করে তোলে গভীর অর্থপূর্ণ—যা সিনেমা ছাড়া অন্য কোন শিল্প মাধ্যমে এত পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। তাই স্মৃতি আর স্বপ্ন এত জরুরি তারকোভস্কির ছবিতে।

সময়প্রবাহে পাখা মেলে দেওয়া বাস্তবতার রঙ রূপ আর রহস্যকে ক্যামেরাবন্দী করাই সিনেমার মূল কাজ আর এইজন্যেই বাস্তবের সঙ্গে এমন নির্ভেজাল যোগসূত্র থাকে সিনেমার (প্রকৃত সিনেমার) যা অন্য কোন শিল্প মাধ্যমে নেই। সেইজন্যে সিনেমাকে তারকোভস্কি বলেছেন 'স্কাল্পটিং ইন টাইম'। কালপ্রবাহকে এমন করে বিষয়বস্তু করে তুলতে পারে না, মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না অন্য কোন শিল্পমাধ্যম।

সময়ঘটিত সিনেম্যাটিক ভাস্কর্যে ভয়ংকর জরুরি হয়ে দেখা দেয় সময়ের গতি

সম্পর্কিত ধারণা। সময়প্রবাহের ক্ষিপ্রতা-মন্থরতা, চাঞ্চল্য বা অলসতা। অনেকটা জলপ্রপাতের সঙ্গে তুলনীয় এই 'সময়প্রপাত' যা চলমান ছবির সূত্র ধরে বয়ে চলে। এখানে মুশকিল আছেঃ ভিন্ন স্থান কালের, ভিন্ন গতিসম্পন্ন বিভিন্ন সময়প্রবাহের একখাতে বয়ে যাওয়া। ছোট বড় নানারকম পাইপের জলপ্রবাহকে যেমন জলচাপের সামঞ্জস্য বজায় রেখে নির্দিষ্ট খাতে বইয়ে দেওয়ার সমস্যা আছে সেইরকমই সমস্যা অর্থপূর্ণ ভাবে 'সময়-প্রপাত'কে বহমান করে তোলা সিনেমার শিল্পকৃতিতে।

গতি সম্পর্কিত 'সময় ভাস্কর্যের' ভাল উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তারকোভস্কির অনেক ছবিতেই। অন্ততঃ তিনরকম সময়ের গতি নিয়ে কাজ করতে হয় চলচ্চিত্রকারকে : ঐতিহাসিক সময়ের গণ্ডী যার ভেতরে সংঘটিত হয়েছে চলচ্চিত্রের ঘটনা, প্রেক্ষাগৃহে বসে ছবি প্রদর্শনের সময়, আর সিনেমার 'ধারণাগত সময়' যা সিনেমার শিল্পকৃতির ওপর নির্ভর করে, যা বিভিন্ন শটের সময় দৈর্ঘ এবং ধারণাগতভাবে সময়ের যে বহমানতাকে সূচিত করা হচ্ছে বিভিন্ন শটের মাধ্যমে তার সম্পর্ক নির্দেশ করে।

'নস্টালজিয়া'তে নায়ক আন্দ্রেই জলশূন্য এক সুইমিং পুলে একটা জলন্ত মোমবাতি নিয়ে চলেছে ডমিনিকোর স্মৃতিতর্পণে। এই দৃশ্য দেখান হল প্রায় ততটা সময় ধরেই যতটা সময় বাস্তবে খরচ হতে পারে এর প্রকৃত কার্য-কলাপে। কিন্তু সিনেমায় তো পাঁচমিনিটের ঘটনা পাঁচমিনিটে দেখান হয়না— দেখানো হয় অনেক কম সময়ে। এখানে সময়ের দীর্ঘায়িত লয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এক নাটকীয়তা যা ছবির চূড়ান্ত দিকনির্ণয়ে সাহায্য করে। আসলে 'স্যাক্রিফাইসে'র এর আলেকজাণ্ডারের মতই ডমিনিকো এক পীড়িত ব্যক্তিত্ব, যে মানুষের মুক্তির জন্য চূড়ান্ত আত্মদানে প্রস্তুত। মার্কাস অরেলিয়াসের অশ্বারোহী মূর্তির অনেক উঁচু পাটাতনে উঠে সে বক্তৃতা দিচ্ছিল ইতিহাসের গতিকে বদলে দেবার জন্য। কেননা ইতিহাসের একটা বিন্দু থেকে সব ভুল খাতে বয়ে গিয়েছে, জন্ম নিয়েছে স্বার্থসর্বস্ব মোহান্ধ এক সমাজ। কিন্তু এই উন্মাদ সমাজ ডমিনিকোকেই উল্টে উন্মাদ আখ্যা দেয় কারণ বিঠোফেন এবং শিলারের ওড টু জয় (অথবা ফ্রিডম) এর বাজনার তালে তালে সে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দেয়। বিশাল দর্শকবৃন্দ বিনা চিত্তচাঞ্চল্যে তা প্রত্যক্ষ করে, যেন কোন সার্কাস ঘটে যাচ্ছে। ডমিনিকোর কুকুরটা প্রভুর জন্যে চীৎকার করে কেঁদে-কেঁদে যায় এক নিষ্ফল জগতে।

ডমিনিকোর সঙ্গে আন্দ্রেই প্রথম থেকে নিজেকে একাত্ম ভেবে নিয়েছিল।

বাস্তব, স্বপ্ন, এবং ভ্রান্তির সীমারেখা প্রায়শই অবলুপ্ত হয়। বাস্তব সময় এবং ধারণাগত সময়ের প্রবাহ একাত্ম হয়ে পড়ে যখন আন্দ্রেইর হোটেল ঘরে হঠাৎ একটা বিশাল কুকুর (আসলে ডমিনিকোর কুকুর) তার বিছানার উপর উঠে বসে, যেন কতদিনের সঙ্গী। ডমিনিকোর এই কুকুরটাই প্রভুর আত্মবিসর্জনের সময়ে কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছিল। যেন একই অমোঘ নিয়তি ডমিনিকো আর আন্দ্রেইকে অনুসরণ করে চলেছে, আর তারই প্রকাশ ওই কুকুর মারফত। ডমিনিকোর আত্মত্যাগের পর পুরনো বাড়িতে যখন আন্দ্রেইর দীর্ঘ পদক্ষেপ ঘটছে নিঃশব্দে তখন হঠাৎ একটা পুরনো আলমারির পাল্লা খুলে যায়। পাল্লার ভেতরে আয়না। সেই আয়নায় আন্দ্রেই মুখ দেখতে গিয়ে দেখতে পায় ডমিনিকোর প্রতিচ্ছবি। আসলে অন্য এক সময়, অন্য এক দেশের স্মৃতিতে আন্দ্রেই প্রবলভাবে পীড়িত। তারকোভস্কির মতনই। নিজের দেশে অফিসিয়াল মতাদর্শের ফেরিওয়ালাদের প্রবল অত্যাচারে তিনি আর ছবি করতে পারছেন না। তাঁর প্রথম ছবি 'ইভানের বাল্যকাল' থেকেই এই আক্রমণ চলে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে আত্মবলি দেওয়া এক বালক ইভানের গল্প নিয়ে এই ছবি। ছবিতে ছড়িয়ে আছে যুদ্ধ, বারুদের গন্ধ আর ভয়াবহতা। জঙ্গী জীবন এবং অবিরত লড়াই। কিন্তু সমস্ত লড়াই ছাপিয়ে বার বার ঘুরে ফিরে আসে ইভানের শৈশবের স্বপ্ন। তলহীন অনির্দেশ্য এক কুয়োর জলে কেঁপে কেঁপে ওঠে ইভান আর ইভানের মায়ের ছবি। কিংবা ইভানের বোন। সমুদ্রের তীরে রোদ মেখে ইভান আর বন্ধুদের আর তার বোনের হুড়োহুড়ি। কিংবা বৃষ্টি ধোওয়া একদিনে ইভান আর তার বোন খোলা গাড়িতে চলেছে। গাড়ি ভর্তি আপেল গাদাগাদি করে ঠাসা, চলমান গাড়ির থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিশাল প্রান্তরে একটা ঘোড়া কোথা থেকে হাজির হয়ে আপেলগুলো অল্প-অল্প চিবিয়ে ফেলে দিয়ে পা মাড়িয়ে চলে যায়। পরিত্যক্ত স্মৃতির মতনই ধু ধু প্রান্তর জুড়ে পড়ে থাকে অনেক আপেল, অর্ধভুক্ত ছড়ান, কাদা মাখা। জঙ্গী এবং কেজো বাস্তবতার ভিতরে কেন এত স্বপ্নের আমদানি তার জন্যেও তারকোভস্কিকে কম কথা শুনতে হয়নি। তারপরে তারকোভস্কি যখন 'আন্দ্রে রুবলভ' করলেন তখন তার 'অকারণ' ভায়োলেন্স নিয়েও অনেক কথা উঠল। কথা উঠল পাগান উৎসব দৃশ্যে প্রচ্ছন্ন যৌনতার প্রাবল্য নিয়ে। গালাগালি চরমে উঠল 'দর্পণ' (মিরর) ছবির সময়ে, কেননা সে ছবিটা ছিল মূলত আত্মজৈবনিক। এত আত্মপ্রেম সমাজবাদী যূথবদ্ধতার নীতিশাস্ত্রে

অপাংক্তেয়। অবশেষে তারকোভস্কি ইটালি চলে যান 'নস্টালজিয়া' ছবির জন্য। কিন্তু প্রবাসে তাঁর শান্তি ছিল না একমুহূর্তের জন্যেও। নিজের দেশের আর সময়ের স্মৃতি তাঁকে উদ্বেল করে তোলে। একইরকমভাবে স্মৃতিপীড়িত হয়ে পড়েছিলেন ছবির নায়কের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন সেই গর্চাকভ— ঠিক যেমন স্মৃতিপীড়িত ছিল ছবির নায়ক আন্দ্রেই (তারকোভস্কির নিজেরই যেন প্রতিরূপ সেই নায়ক)। অন্য স্থান এবং অন্য কালের এই স্মৃতি যেন আমৃত্যু এক গভীর অসুখ। সেই অসুখ গোটা সমাজকেও যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই স্মৃতি এবং স্বপ্নসমৃদ্ধ, সমান্তরাল বিভিন্ন সময়প্রবাহকে কখন দীর্ঘ বিলম্বিত কখন দ্রুত কখন বা স্বাভাবিক মসৃণ লয়ে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে আর মিলিয়ে দিতে গিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই মুছে দেওয়া হয় মাঝে মাঝেই বাস্তব আর কল্পনার, স্বপ্নের আর স্মৃতির সীমারেখা, যদিও টেকনিকালার এবং সেপিয়া রং এর ব্যঞ্জনায় আলাদা করা হয় বর্তমানের বাস্তব এবং অন্য স্থান—অন্য কালের উন্মেষকে। সময়ের গতিপ্রবাহের এই আশ্চর্য অর্কেস্ট্রেশন এক চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে যায় যখন আন্দ্রেই ডমিনিকোর স্মৃতি তর্পণে মোমবাতির আলো আড়াল করে এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে মরা সুইমিংপুলের ভিতরে। অনেকটা একইরকম যাত্রার কল্পনা আছে 'স্যাক্রিফাইসে'। অটো যখন আলেকজাণ্ডারকে বলল, চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আলেকজাণ্ডারকে মারিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে রাত্রিবাস করতে হবে। তার আগে আলেকজাণ্ডার হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য। কী ভয়ংকর সেই ধ্বংসের কল্পনা। জলাশয়ে জল থাকবে না, আকাশে পাখি থাকবে না, গাছ থাকবে না, ফুল থাকবে না। সমস্ত প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মৃত্যুর শুধু জান্তব ভীতিতেই কেঁপে কেঁপে ওঠা নয়, মানুষের এবং জীবনের বংশধারা রক্ষার, মানুষের যাবতীয় স্মৃতি, কবিতা আর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবার উদগ্র আকাঙ্খায় ঈশ্বরের কাছে সমস্তকিছু সমর্পণ করতে চায় সে। মৌনব্রত অবলম্বনের প্রতিজ্ঞা করে আলেকজাণ্ডার (কেননা কথার মূল্য হারিয়ে গেছে অনেক আগেই)। শুধু তাই নয়, তার সমস্ত পার্থিব সম্পদ, সুখ, বাড়িঘর এমনকী নিজের আদরের সংসার ত্যাগ করতেও প্রস্তুত আলেকজাণ্ডার। এরপর অটোর কথামতো মারিয়ার বাড়িতে তার নৈশযাত্রা। সময়কে দীর্ঘায়িত লয়ে বাঁধা হয় এইখানে। জলকাদা মাড়িয়ে শংকিত কম্পিত চিত্তে আলেকজাণ্ডারের দীর্ঘ যাত্রা দীর্ঘতর হয়। অবশেষে মারিয়ার বাড়ি পৌঁছয় এবং আত্মসমর্পণ করে।

শব্দের অপলাপের প্রসঙ্গ আগেই তোলা হয়েছিল ছবিতে। মানুষের যে অবিরত নির্মাণকার্য চলে তার মননে কিংবা ভাষার জগতে তা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিশুদ্ধ সংযোগ হারিয়ে ফেলে। মানুষের নির্মিত জগতে, বোধ এবং বুদ্ধির সাজান ইমারতে প্রকৃতির চেহারা বিকারগ্রস্ত হয়ে ধরা পড়ে এর অনিবার্য ট্র্যাজেডিতে। আলেকজাণ্ডারও তাই মারিয়ার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ মারফত তার নির্মিত জগতের, সাজান ইমারতের অবিনির্মাণ প্রার্থনা করে। মা'র মৃত্যুর সময়কার এক অদ্ভুত স্মৃতির উন্মেষ ঘটে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে আলেকজাণ্ডার মা'র কাছে বেড়াতে গিয়ে দেখল বাড়ির বাগানটা কেমন অগোছাল। আগাছা ভর্তি। সাতদিন দিনরাত পরিশ্রম করে যখন সাজান বাগান নির্মিত হল আলেকজাণ্ডারের কোদাল বেলচার প্রবল প্রহারে তখন দেখা গেল যত্নরচিত কিন্তু প্রাণহীন, বর্ণাধিক্যের বর্ণহীন, স্থবির একমাঠ বৃক্ষসজ্জা—যেন গোটা বাগানটার অপমৃত্যু ঘটেছে নিষ্ঠুর প্রহারে। ঠিক যেমন হয়েছিল ছোটবেলায় আলেকজাণ্ডারের বোনের চুল কাটার ব্যাপারে। ভারী সুন্দর চুল ছিল তার। কিন্তু অনেক যত্নে ফ্যাশন দুরস্ত উপায়ে যখন তার চুল ছাঁটা হল, বাবা কেঁদে আকুল। মেয়ের সুন্দর চুলের গোছা ফ্যাশনের নির্মিত সজ্জার প্রাবল্যে শেষ হয়ে গেছে। গভীর সহমর্মিতায় মারিয়া যখন আলেকজাণ্ডারকে গ্রহণ করে তখন হঠাৎ যেন সময়ের ঘড়ি থমকে দাঁড়ায়। শরীর সমর্পণের এক আশ্চর্যদৃশ্যে দেখা যায় বিছানার অনেক ওপরে শূন্যের মধ্যে মারিয়ার শরীরে আশ্রয় নেওয়া আলেকজাণ্ডারের শরীর বৃত্তাকারে মসৃণ গতিতে ঘুরে চলছে আর সেই নিউক্লিয়ার হলোকাস্টের পূর্বতন স্বপ্নদৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই ভোগসর্বস্ব প্রযুক্তির পরিত্যক্ত প্রাঙ্গণে ছুটে চলা অনেক নগ্ন শরীর। যেন পৃথিবীর শেষ আর তাইতো সময়ের ঘড়ি থমকে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে ডস্টয়েভস্কি থেকে লাগসই উদ্ধৃতি আছে যা তারকোভস্কি ব্যবহার করেছেন অন্য এক আলোচনা-ক্ষেত্রে। 'দি পজেসড্' উপন্যাসে স্তাভরোগিন বলছে "চূড়ান্ত সর্বনাশের মুহূর্তে (অ্যাপোক্যালিপ্‌স) 'সময়' আর থাকবে না—দেবদূতেরা বলেছেন" কিরিলভ বলে, "ঠিক কথা। সমস্ত মানবজাতি যখন 'সুখ' খুঁজে পাবে তখন আর 'সময়' থাকবে না কেননা 'সময়ের' প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না।"

স্তাভরোগিন : তাহলে 'সময়' কে কোথায় রাখা হবে ?

কিরিলভ : কোথাও রাখা হবে না। 'সময়' কি কোন বস্তু ? 'সময়' একটা 'ধারণা' মানুষের মনের মধ্যেই তার মৃত্যু হবে।

সময়ের জাদুকর তারকোভস্কি তাই কখন সময়প্রবাহকে স্তব্ধ করে কখন চঞ্চল

মুখর করে, কখন মন্থর দীর্ঘায়িত করে আমাদের স্মৃতি-স্বপ্ন-কবিতার আশ্চর্য উন্মেষ ঘটিয়ে অস্তিত্বের গভীরে চলে যান। হৃদয়-মস্তিষ্কপ্লাবী, ব্যাপক এক অর্থবহ সিনেম্যাটিক উপায়ে প্রকৃত সিনেমা স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠা পায়। সময়ের এই ভাস্কর্য ভিন্নতর এক অসাধারণ ছকে সঞ্চারিত হয় 'আন্দ্রে রুবলভ' ছবিতে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত আইকন পেইন্টারকে নিয়ে তোলা এই ছবি তারকোভস্কির প্রিয়, ধারাবর্ণনা বা ক্রনিকল এর ঢঙে পরিবেশিত। সত্যের সন্ধানে আন্দ্রে রুবলভের যাত্রা স্থানকালের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। প্রতিতুলনায় অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় বুনুএলের 'নাজারিন'। কিন্তু নাজারিনে কুইকজোটিক ব্যঙ্গের মাত্রা খুবই প্রকট। এখানেও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আভাস আছে। প্রথম দৃশ্যেই এক সরলমতি কৃষক খোলা বেলুনে করে আকাশে উড়তে চায়। উড়তে উড়তে দেখে নিতে চায় অনেক নীচের পৃথিবীর রূপ—একমুঠোয় ধরতে চায় নীচের জগৎ আর জীবন, যেন এক বিশ্ববীক্ষার অন্বেষণ, কী বিদ্ঘুটে উপায়ে। কিংবা বিদ্ঘুটে সেই 'সঙ'-এর লাগামছাড়া ক্যারিকেচার—সেখানে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য রুবলভ ও তার সঙ্গীসাথীরা হাজির হয়। ধর্মীয় অনুশাসনের গম্ভীর জগতের কাছে সঙ-এর আতিশয্য যেন এক রূঢ় প্রতিবাদ, তথাকথিত শৃঙ্খলা এবং ভব্যতাকে যা চ্যালেঞ্জ জানায় প্রাকৃত বদরসিকতার আতিশয্যে। আর এই আতিশয্যের জন্যেই গ্রেপ্তার হতে হয় ওই সঙ-কে—তাকে নির্দয় প্রহার করতে-করতে অন্ধ কুঠুরিতে নিয়ে যায় সৈন্যরা। কিন্তু অশরীরী ঈশ্বরপ্রেমী রুবলভকে চরম যন্ত্রণা ও বীভৎস অত্যাচারের নরক দর্শন করতে হয়। শরীরী প্রেমের এক উৎসবের বিকট সংঘাত, শরীরী পৃথিবীর সত্য অন্বেষাকে নতুন চেহারায় হাজির করে। অশরীরী থেকে শরীরী জগতের অস্তিত্বের শিকড়ে পৌছনর জন্য তাকে যে কাঁটার মুকুট তুলে নিতে হয় তার পদ্ধতি বর্ণনায় এমন এক সিনেম্যাটিক ছক ব্যবহার করা হয় বইয়ের অনুচ্ছেদভাগের মতন যেখানে সময়ের তাল-লয় বিশেষ মাত্রায়, বিশেষ ছন্দে বাঁধা—যার ফলশ্রুতিতে রুবলভের সত্যদর্শন অদ্ভুত তাৎপর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্যাশনের তীব্র শারীরিক চেহারা সেখানে এক নতুন বোধের সঞ্চার ঘটায়, নতুন মাত্রায়। ধরা যাক পাগান প্রেমের সেই উৎসব যা রুবলভের যাত্রাপথে দেখা দিল। সেন্ট জনের নৈশ উৎসবে পাগানরা লাগামছাড়া শারীরিক প্রেমে রত খোলা আকাশের তলায়। সেখানে অনেক মশাল জ্বলে উঠেছে। প্রেমের এই 'বেহায়াপনা' রুবলভের গোঁড়া চার্চের রুচিবোধে ভয়ংকর নীতিবিগর্হিত। তাই এই উৎসবের প্রতিবাদ করতে যায় রুবলভ, ফলে প্রচণ্ড প্রহার। শুধু প্রহারই নয় তাকে একটা ক্রুশের সঙ্গে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

রুবলভ প্রতিবাদ জানায়। ধর্মগ্রন্থের বর্ণনাই যদি সত্যি হয় তাহলে মাথা নীচে আর পা ওপরে করে ঝুলিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। এভাবে ঝোলানো শুধু অনুচিত নয়, নিতান্ত ব্লাসফেমি। এক সুন্দরী মায়াবিনী ওই অবস্থাতেই রুবলভকে আদর করতে থাকে আর প্রচণ্ড শারীরিক প্রেমের আহ্বান জানায়। রুবলভের তত্ত্ব কথায় বিরক্ত হয়ে মেয়েটি বলে 'আরে বোকা, উল্টো করে ঝুলতে চেয়েছিলে কেন? ওতে তো ভয়ংকর যন্ত্রণা হত।' অবশেষে মেয়েটিই রুবলভকে মুক্ত করে, কিন্তু শারীরিক প্রেমের মতো ভয়ংকর পাপের প্রস্তাব কিছুতেই মানতে পারে না রুবলভ। এরপর দীর্ঘায়ত এই প্রেমের উৎসবের দৃশ্যে দেখা যায় নগ্ন ওই মায়াবিনীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সৈন্যদের ছুটোছুটি আর মেয়েটি জলের মধ্যে দিয়ে সাঁতরে পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে মাঝনদীতে সেই নৌকোর ওপর আশ্রয় নিতে চাইছে যেখানে রুবলভ রয়েছে। প্রচণ্ড অনীহায় রুবলভ শুধু নিজের চোখই বন্ধ করে না, অন্যদেরও চোখ বন্ধ করতে হুকুম দেয়। দীর্ঘলয়ের কালপ্রবাহে এইরকম ঘটনাপ্রবাহ ডানা মেলে দেয়— সময়প্রবাহের এই সিনেম্যাটিক বহমানতা এমন পর্দায়, এমন স্বরে বাঁধা হয় যে ঘটনার নিজস্ব কাল অতিক্রম করে রুবলভের অশরীরী জগত খান খান হয়ে ভেঙে যেতে চায়। এমনই সময়প্রবাহ পরিকল্পনায় বাঁধা হয় তাতার আক্রমণের নারকীয় দৃশ্যাবলী যা শরীরী জগতের সত্যঅন্বেষণে রুবলভের অস্তিত্ব নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেয়। অবশেষে এক জড়বুদ্ধি মেয়েকে বাঁচানোর জন্য এক তাতার সৈন্যকে হত্যা করতে বাধ্য হয় রুবলভ। দারুণ আক্ষেপে তার মন ভরে যায়। স্যাক্রিফাইসের এর আলেকজাণ্ডারের মতোই অবশেষ সে মৌনব্রত অবলম্বন করতে চায়। এত যন্ত্রণার পৃথিবীতে মানুষের মুক্তির জন্য সে চূড়ান্ত আত্মদানের জন্যে প্রস্তুত হয়। কিন্তু মুক্তির রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল অন্যভাবে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত রাশিয়ায় পুনর্নির্মাণের জন্য তখন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এক ধাতুশিল্পীও চলেছে একটা দলের মধ্যে কোন এক গীর্জার বিশাল ঘণ্টা তৈরি করতে হবে। তার বাবা মারা গিয়েছে কিছুদিন আগে। মৃত্যুকালে নাকি বাবা তার কাছে রেখে গিয়েছে ঘণ্টা বানাবার মন্ত্রগুপ্তি।

বিশাল কর্মযজ্ঞের শেষে যখন ঘণ্টা তৈরি হয়ে প্রথম বেজে উঠল, ধাতুশিল্পী ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বাবা তাকে কোন মন্ত্রগুপ্তিই দিয়ে যায় নি মৃত্যুর সময়। যা ঘটল সবই তাকে কাজের ভেতর দিয়ে আবিষ্কার করে নিতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্ম ঘটে গেল রুবলভের। নিজের থেকেই মৌনব্রত ভেঙে সে ছেলেটিকে বলে উঠল, আবার আমি আইকন চিত্রায়ণ শুরু করব।

তুমি গীর্জায় গীর্জায় ঘন্টা বানাবে আর আমি ছবি এঁকে যাব। দুই প্রজন্মের শিল্পীসত্তায় আশ্চর্য মিলন ঘটল আর এইবার শাদাকালো ছবির দাঁড়ি টেনে রঙীন চিত্রে একটার পর একটা ভেসে উঠল রুবলভের নতুন নতুন সৃষ্টি। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। একপাল ঘোড়া শুধু ভিজেই যাচ্ছে।

সময়ের গতিপ্রবাহের আরেক অর্কেস্ট্রেশন 'সোলারিস' ছবিতে। সেখানে এক মহাকাশ যানে অনির্দেশ্য যাত্রা শুরু হয়েছে সোলারিস নক্ষত্রের দিকে। ওই নক্ষত্রে নাকি এক আদিম প্রাণসমুদ্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যখনই তার কাছাকাছি মহাকাশযান এসে পড়ে, নানারকম অলৌকিক ঘটনাবলী শুরু হয়ে যায়। মহাকাশযাত্রীরা ইচ্ছেমতন তাদের অতীত সময়ে ফিরে যায়। তাদের ইচ্ছাপূরণ ঘটে। এখানে সময় সম্বন্ধে একটা 'প্যারাবল' রচিত হয়েছে সিনেম্যাটিক পদ্ধতিতে—তার মধ্যে সিনেমার চরিত্রের একটা দিকও নিহিত আছে। তারকোভস্কির মতে সিনেমার অসামান্য বৈশিষ্ট্য হল সেই 'সময়'কে ধরে রাখা যে সময় আসলে পুনরাবৃত্তিতে অক্ষম। সময়-সমুদ্রে ভেসে চলা ঘটনা তখনই তার প্রকৃত সিনেম্যাটিক রূপ গ্রহণ করে যখন সময়ের মধ্যে সেই ঘটনার অস্তিত্বই শুধু টিকে থাকে না, 'সময়' ও বেঁচে থাকে ওই ঘটনার ভেতরে। তাই সিনেম্যাটিক চিত্রকল্পে পুনরাবৃত্তিতে অক্ষম 'সময়' পুনরাবৃত্ত হয়। সেই 'সময়' নতুন করে বহমান হয় সিনেমার পর্দায় আর তাহলে নিশ্চয়ই বর্তমানের গণ্ডীতে বহমান অতীত 'সময়' মানুষের চেষ্টায় নতুন রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে। এমনকি ইচ্ছাপূরণের উপায় হিসেবে তার পুরনো রূপ আমূল বদলে ফেলতে পারে ?

তাই সোলারিসের নায়কের ইচ্ছাপূরণের জন্য তার মৃত স্ত্রী ফিরে আসে। তাদের পুরনো স্মৃতি আর স্বপ্ন নতুন করে সংঘটিত হয় বর্তমানের গণ্ডীতে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। অতীতের মতনই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মারা যায় নায়কের স্ত্রী (নাতালিয়া বন্দেরচুক)।

আর এই সময় দর্শন, সময়-স্মৃতির দ্বার পরিগ্রহণে তারকোভস্কির ছবিতে অনুসৃত হয় এমন সব শব্দ-দৃশ্যাবলী যা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা মানুষের সভ্যতার এক বিশাল প্রাসাদ গড়ে তোলে সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করে—যাকে মার্শাল প্রুস্ত বলেছিলেন 'ভাস্ট এডিফিস অব মেমোরিজ' যে কথার পুনরুক্তি তারকোভস্কির ছবিতে এবং লেখায় ঘুরে ফিরে আসে। কিন্তু সময়বদ্ধ, স্মৃতিপীড়িত এই অসহনীয় যুগযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কোথায় ! এই খানেই সিনেমার বিষয়ান্তর ঘটে। গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসচালিত একটা মন আকুল আগ্রহে পরম এক বিশ্বাসের অপেক্ষায় থাকে, যা মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ

দেবে। কিন্তু পথনির্দেশ কি পাওয়া যায়? যা পাওয়া যায় তা হল এক আত্মধ্বংসী, মর্ষকামী, আত্মদানের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। পৃথিবীর মুক্তি নেই অন্যকিছুতেই। সোনা ফলানো যে মানবজমিন পতিতই হয়ে রইল, বিশ্বাসের আগুনে সর্বস্ব আহুতি না পেলে, খাঁটি সোনার ফলন ফলবে না সেখানে— বন্ধ্যাই থেকে যাবে বিশাল সম্ভাবনাময় এই মানবজমিন।

তাই আন্দ্রে রুবলভের আত্মধ্বংসী কামনা। নস্টালজিয়ার ডমিনিকো আর আন্দ্রেই এর আত্মাহুতি। স্যাক্রিফাইসের আলেকজাণ্ডারের আত্মদান।

ঈশ্বরচিন্তার এক পরমবিশ্বাস, একনিষ্ঠ খৃষ্টান ধারনা এখানে অন্তর্লীন হয়ে আছে। তারকোভস্কির বাবা ছিলেন রাশিয়ার এক বিখ্যাত কবি—যাঁর কবিতা বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে তারকোভস্কির ছবিতে। সেই বাবার সূত্রেই একদিন আলাপ হয়েছিল বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী লাণ্ডাউ এর সঙ্গে। তারকোভস্কি তখন বালকমাত্র। লাণ্ডাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আচ্ছা ভগবান কি আছেন?'

লাণ্ডাউ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছিলেন 'আমার মনে হয় ঈশ্বর আছেন।'

আসলে ঈশ্বর আছেন কি নেই তার থেকেও জরুরি হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা, ঈশ্বরের ধারণা। দুর্জ্ঞেয় পরিবেশ ও তার প্রকৃতিতে অপদস্থ, অসহায় মানুষ আজ এত ওপরে উঠে এসেছে তার একটা বিরাট আত্মিক অবলম্বন ঈশ্বরের ধারণায় যা দিয়ে বিপুল এই জীবন আর জগৎকে নিজের কল্পনার চৌহদ্দিতে ধরে নেবার স্পর্ধা পায় মানুষ।

মানুষের স্বপ্ন-স্মৃতি-কবিতার বংশধারা রক্ষার, প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ-আনন্দ-যন্ত্রণা, আশা-নিরাশার কালচক্র অতিক্রান্ত প্রবহমানতার জন্য, পৃথিবীর মানুষের অমরত্বের সন্ধানে ঈশ্বরের এই মানুষী পরিকল্পনা। গভীর আধ্যাত্মিকতায় লিপ্ত তারকোভস্কি মনে করতেন আধ্যত্মিক মাত্রা বাদ দিয়ে মানুষের 'স্মৃতির' অস্তিত্ব কল্পনাতেও ভাবা যায় না। 'সময়' ছাড়া 'স্মৃতি' হয় না কিন্তু শুধু সময়ের পটভূমিতে 'স্মৃতি'-কে ব্যাখ্যা করা যায় না কখন। কিন্তু মানুষের মনে 'স্মৃতি' এনে দেয় গভীর অতৃপ্তি। কখন কখন এই অতৃপ্তি এক আমৃত্যু অসুখের মতন হয়ে দাঁড়ায়। অন্য সময়, অন্য স্থানের স্মৃতিকে কালাতিক্রান্ত, শাশ্বত করে রাখবার প্রয়াসে সময়ের ঘড়ি স্তব্ধ করে দেবার অসম্ভব প্রয়াস চলে। যেমন চলেছিল ডমিনিকোর কল্পনায়। একটা ছোট্ট বাড়িতে কুড়ি বছর ধরে তার পরিবারকে বন্ধ করে রেখেছিল ডমিনিকো। তার বাইরের জগৎ

যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ডমিনিকোর আত্মাহুতির পর পুলিশ যখন তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করল, ডমিনিকোর ছোট ছেলে হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—এই কি পৃথিবীর শেষ? কোথায় যেন মিল আছে সার্ত্র এর নাটক 'কনডেম্‌ড অ্যাট আনাতোলি'র সঙ্গে। অবশ্যই সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে ও অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে সার্ত্রএর নায়ক, ফ্যাসিস্টদের সংযোগী গণশত্রুকে বছরের পর বছর একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রেখেছিল তার বোন। যেন সেইখানেই পৃথিবীর শেষ। ফ্যাসিস্ট নিপীড়ণের হলোকাস্ট—বাইরের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় ছেলেরা ভিখিরি আর মেয়েরা বেশ্যা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রকম এক কাল্পনিক জগতের বিভীষিকায় ছেলেটি অনুতাপে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যাক—এই ছিল বোনের আশা।

আসলে কিন্তু বাইরে তখন ঝলমল করছে আলো আর প্রাচুর্য। যুদ্ধের স্মৃতি কোথায় মুছে গিয়েছে—মুছে গিয়েছে যুদ্ধ অপরাধের পাপপুণ্যবোধ। যুদ্ধোত্তর প্রাচুর্যে গা ভাসিয়ে হাসি আর ফুর্তির প্রবল জোয়ার শুরু হয়েছে বাইরের পৃথিবীতে।

তাই তারকোভস্কির কল্পনায় স্মৃতিবিগর্হিত, ভোগান্ধ এই সমাজের মুক্তির জন্য, মানুষের মহিমা নিয়ে মানুষের বংশগতি রক্ষার জন্য, নতুন করে জীবনের মুক্তিকামী স্মৃতি আর স্বপ্নের উন্মেষ ঘটানোর জন্য এক মর্ষকামী আত্মনাশের ইচ্ছা উগ্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আর এই আত্মপ্রকাশ এত ব্যাপ্ত এত তীব্র যে দীর্ঘ ছ' মিনিট লেগেছিল স্যাক্রিফাইসের আলেকজাণ্ডারের বাড়ি আত্মাহুতির আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যেতে। সিনেমার ইতিহাসের দীর্ঘতম, অবিস্মরণীয় এই শটে দেখা যায় আলেকজাণ্ডার নিজের হাতে তার বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। কেননা মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মারিয়ার কাছে শরীর সমর্পণের আগে, ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনায় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল,আণবিক ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পেলে সে তার সুখ, সংসার আর আশ্রয়—সমস্ত কিছু আত্মাহুতি দেবে। তাই বাড়ির অন্য সবাই যখন পরদিন সকাল বেলার প্রাতরাশের পর প্রাতঃভ্রমণে রত তখন আলেকজাণ্ডার বাড়ির আসবাবপত্র জড়ো করে, বাড়ির ভেতরেই, উপরের বারান্দায় আগুন ধরিয়ে দেয়। বীভৎস সেই আগুনের লেলিহান শিখা একটু একটু করে বাড়িটা গ্রাস করতে থাকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হয়। ওপরের ঘরে তখন স্টিরিও রেকর্ডারে বেজে যাচ্ছিল অন্তিম স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত রিকোয়েম। সে বাজনাও থেমে যায়। আগুনের কালো ধোঁয়া ওপরে উঠতে থাকে আর আণবিক সর্বনাশের কল্পদৃশ্যের মতোই কমলা আর লাল আগুনের শিখা তার লকলকে

জিভে অন্তিম সর্বনাশের বিকট মুখ যেন চেটে চেটে উপভোগ করতে থাকে। বিকট আওয়াজে ধসে পড়তে থাকে দরজা, জানলা আর দেওয়াল। এই কাল্পনিক আত্মদানের মতোই সত্যি-সত্যি সিনেমার আয়োজনের আত্মাহুতিও ঘটতে চলেছিল শটিং এর সময়।

আগুনে বাড়িটা পুড়ে যেতে-যেতে হঠাৎ ক্যামেরা বিকল হয়ে পড়েছিল। ছবি তোলবার পর দেখা গেল শটটা আদৌ ওঠেই নি। দীর্ঘ চারমাসের হাড় ভাঙা পরিশ্রম নিষ্ফল হয়ে গেল। কিন্তু তারপর আশ্চর্যজনক ভাবে প্রবল নিষ্ঠা আর অসহনীয় পরিশ্রমে আবার গড়ে তোলা হল সেই বাড়ি, হুবহু এক, নিখুঁত। এবার দুটো ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছিল। ঠিক ঠিক দৃশ্য গ্রহণ শেষ হলে আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল দলের সবাই। গোটা দলটা তখন উৎসবে মেতে উঠেছে। পাগলের মতো আলিঙ্গন করছে একজন আরেকজনকে। সিনেমার নাটকের সমান্তরাল এ এক জীবনের নাটক।

নাটকীয়তা সম্পর্কে তারকোভস্কির কিছু নিজস্ব মন্তব্য আছে, যা তাঁর স্যাক্রিফাইসের প্রতিতুলনায় অন্যান্য ছবি মিলিয়ে দেখলে অর্থবহ হয়ে ওঠে।

সিনেম্যাটিক পদ্ধতিতে সময়প্রবাহের যে গতিপরিবর্তন নাটকীয়তার মাত্রা এনে দেয় তার বিশেষ উদাহরণ হিসেবে স্যাক্রিফাইসের উল্লেখ আছে তারকোভস্কির লেখায়। সেখানে বিভিন্ন চরিত্রের কথায় এবং কাজে নাটকীয়তার বিস্ফোরণ বিন্দু স্পর্শ করে যাচ্ছে বারে বারে। কিন্তু মানব সভ্যতার অন্তিম সর্বনাশের প্রান্তভূমিতে, বেদনাক্লিষ্ট আলেকজাণ্ডারের স্মৃতি আর স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে জীবনের 'পুনর্জন্মের' চেষ্টায়, কিংবা অমোঘ প্রকৃতির মতোই এক রহস্যময়ী নারীর কাছে শরীর-মন সমর্পণের আশ্চর্য সুখের পর সর্বস্ব আত্মাহুতির অদ্ভুত পরিতৃপ্তিতে এবং সর্বোপরি সেই আশ্চর্য নির্জন প্রান্তভূমির অদ্ভুত শব্দ এবং স্বরের গায়ে কাঁটা দেওয়া আবর্তনে (সেই শব্দ পরিমণ্ডলে আছে মেষপালক কিংবা রাখালের বিষণ্ণ ডাক, কোন অজানা লোকসংগীতের সুরবাদ্যের ছেঁড়া টুকরো, বাঁশির অসমাপ্ত টান…) ছবির নাটকীয় গতিপ্রবাহে এক আশ্চর্য কাব্যিকতার মাত্রা সংযোজন হয়। তুলনায় ততখানি 'নাটকীয়' নয় তাঁর আগের ছবি 'নস্টালজিয়া'। সেখানে মাত্র দুটি জায়গায় নাটকীয়তার উন্মেষ আছে— ডমিনিকোর গায়ে আগুন জ্বালিয়ে আত্মাহুতির দৃশ্যে এবং যেখানে ডমিনিকোর স্মৃতিতর্পণে আন্দ্রেই একটা জ্বলন্ত মোমবাতির শিখা বাতাসের ঝাপ্টা বাঁচিয়ে হাতের আড়ালে—কখন কোটের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বার বার তিনবার সেই মোমবাতি নিভে যায় এবং নতুন করে তার যাত্রা শুরু করতে হয়

মোমবাতি জ্বালিয়ে। অবশেষে সক্ষম হয় জ্বলন্ত মোমবাতির স্মৃতিতর্পণে এবং এই তর্পণের শেষেই আমৃত্যু স্মৃতিতাড়িত, স্বপ্নপীড়িত তার গভীর অসুখ তার মৃত্যু ডেকে আনে সেইখানেই।

আন্দ্রে রুবলভের "নাটকীয়তা" আবার সম্পূর্ণ অন্য মাত্রায় বাঁধা। সেখানে কোন চূড়ান্ত নাটকীয়তার অন্তিম বিন্দু নয়, ঘটনাপরম্পরা এবং সময় প্রবাহের সংঘাতে যে 'নাটকীয়তা' গড়ে উঠেছে, সিনেমার পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদান্তরে, তার চেহারা বিশাল পর্বতমালার মতো—অসংখ্য পাহাড়ের অসংখ্য শীর্ষবিন্দুর বিশাল পরিব্যাপ্তিতে। এই বিশাল ব্যাপ্তির পরিমণ্ডলে রুবলভের যখন চূড়ান্ত উপলব্ধি ঘটল—মৌনব্রত ভঙ্গ করে যখন সে ঠিক করল আবার আইকন পেন্টিং শুরু করবে (তার সঙ্গে থাকবে নতুন প্রজন্মের সেই ধাতুশিল্পী, গীর্জার ঘণ্টা বানাবার জন্য)—তখন কিন্তু তা নাটকীয়তার ঊর্ধ্বে চলে যায়। দৃশ্য বা শব্দের প্রকরণগত নাটকীয়তা অতিক্রান্ত, কালাতিক্রান্ত এক উপলব্ধির সঞ্চার ঘটে যা শুধু সিনেমাতেই সম্ভব, নাটক বা অন্য শিল্প মাধ্যমে নয়। সোলারিসে আবার সেই রকম নাটকীয়তা নেই। সেখানে সিনেমার শরীর গড়ে উঠেছে এক অদ্ভুত পরিবেশ বিষণ্ণতায়—তার কেন্দ্রে আছে সময়ের সিঁড়ি বেয়ে চলা এক স্বপ্নযাত্রা যেখানে মানুষের দুঃসহ স্মৃতি বহন করে আনে সময়কে উল্টে দেবার স্পর্ধা এবং একই সঙ্গে মানুষের অমোঘ ট্র্যাজেডি। কোথায় যেন মানসিকতার মিল আছে তারকোভস্কির সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের, যদিও সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশ এবং অন্য প্রেক্ষাপটে ঋত্বিকের ছবি তৈরি হয়েছে—প্রসঙ্গ ও বিষয়েরও খুব মিল নেই। কিন্তু আমার কাছে একটা অদ্ভুত আত্মিক মিল আত্মপ্রকাশ করে ঋত্বিকের সুবর্ণরেখায় ঈশ্বরের দুঃস্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে আত্মদর্শনের আর শহরের নরকদর্শনের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের আত্মদর্শনের আর আত্মাহুতির পরিকল্পনায়।

'তুমিও দেখি শূন্যে দোদুল্যমান···দুর্ভিক্ষ দ্যাখে নাই, দাঙ্গা দ্যাখে নাই··· অ্যাটম জানে না। ইহারাই অমৃতের সন্তান।' ঋত্বিকের এই সামাজিক হলোকাস্টের বর্ণনায় কোথায় যেন মিল আছে স্যাক্রিফাইসে আলেকজাণ্ডারের হলোকাস্টের। কিংবা, আনন্দ-যন্ত্রণার সিঁড়ি বেয়ে তিতাস এ একটি জনগোষ্ঠীর বেদনাদায়ক উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আন্দ্রে রুবলভের নতুন জীবনের উন্মেষে। আক্ষরিক মিল খোঁজা বৃথা এবং হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোথায় যেন দুই শিল্পীর দুই ধরনের সৃষ্টির টুকরো টুকরো রেশ এক তুলনীয় মানসিকতার আভাস দেয়। বিশেষ করে পাগান প্রেমের উৎসব দৃশ্যে যখন নৌকো করে রুবলভরা চলে যাচ্ছে আর সাঁতরে

পালাচ্ছে সেই রহস্যময়ী মেয়েটি সৈনিকদের হাত থেকে—সে রুবলভের নৌকোতেই উঠতে চায়। এই দৃশ্যটি আমার মনে হয়েছে তিতাসের বাইচ খেলার দৃশ্য এবং নদীকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর তীব্র প্যাশন সমৃদ্ধ উত্থান-পতনের বর্ণনার সঙ্গে কোথায় যেন আত্মিক ভাবে জড়িয়ে আছে।

অবশ্যই ঋত্বিকের মানসিক ট্র্যাডিশন ভিন্নতর। তাই সুবর্ণরেখায় শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর এক শিশুর হাত ধরে অমৃতের সন্ধানে যায়, আর স্যাক্রিফাইসে আলেকজাণ্ডার আত্মাহুতির ভেতরেই অমৃতের সন্ধান চায়। আলেকজাণ্ডারের বাড়ি যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তখন ছুটে আসে তার স্ত্রী-কন্যা আর পারিবারিক ডাক্তার। মারিয়াও কাজে যোগ দিতে এসে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য অনুধাবন করে। কিছুতেই কিছু বলবে না আলেকজাণ্ডার। কেননা 'শব্দের' প্রতি আস্থাহীনতায় সে মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। অতএব এই উন্মাদসমাজ সেই আলেকজাণ্ডারকেই উন্মাদ বলে জোর করে ধরে নিয়ে যায় উন্মাদাগারে, যদিও আলেকজাণ্ডার এক সুস্থ পৃথিবীকেই আবাহন করতে চেয়েছিল।

আর আলেকজাণ্ডারের মৌনব্রতের বিপরীত বিন্দুতে দেখা গেল এতক্ষণ চুপ করে থাকা আলেকজাণ্ডরের ছোট্ট ছেলেটা হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছে। 'ইন দি বিগিনিং দেয়ার ওয়াজ দি ওয়ার্ড, হোয়াই পাপা?' বাবার কথামতো পাতাহীন মরা গাছটার গোড়ায় সে নিয়মিত জল দেয়। এক আশ্চর্য বিশ্বাসের জল। মানুষের প্রত্যয়হীন সমাজ যা হয়ত একদিন প্রাণসঞ্চার করবে। ছোট্ট গাছটা মহীরুহের মতো তার শুকনো ডালপালা যেন কল্পনায় মেলে ধরছে···আরও কাছে এসে আরও বড় হয়ে উঠছে সে। পেছনে জ্বলন্ত সূর্য আর আশার সঙ্গীত-তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। একদিন কি সত্যি সত্যিই পাতায় ভরে যাবে এই মরা ডালগুলো? সত্যি সত্যিই কি প্রাণের সঞ্চার ঘটবে? স্মৃতির আর স্বপ্নের পুনর্জন্মে, জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসায় কি জীবনের উৎসব আবার শুরু হবে নতুন করে? সেই ভালবাসা আর প্রত্যয়ে আমরা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি। □

SPACE DONATED BY :

A WELL WISHER

আন্দ্রেই তারকোভস্কি

....

শিল্প জিজ্ঞাসা

শিল্প জিজ্ঞাসা, শিল্পতত্ত্বের সন্ধান শুধু কবি আর লেখকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেন শিল্প, কার জন্য শিল্প—সর্বকালের শিল্পীই এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। এবং প্রত্যেক শিল্পীকে বেছে নিতে হয়েছে তাঁর নিজের পথ। এক জনের পথের সঙ্গে অন্যজনের পথের অমিলও বড় কম নয়। প্রত্যেক শিল্পীই চালিত হন তাঁর নিজের নিয়ম, সূত্র অনুসারে। অন্যরা সেই সূত্র মেনে চলতে বাধ্য নন। শিল্প সাধনায় মত ও পথের অন্ত নেই।

বাজারের পণ্য না হলে, (অর্থাৎ যেখানে ভোক্তাতুষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য) শিল্পীকে এমন এক প্রশ্নের উপর আলো ফেলতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে, যা আমাদের অস্তিত্বকে কাটা ছেড়া করে: কেন বেঁচে আছি, কেন এই জন্ম।

প্রকৃতির কিরীট মানব ধরায় এসেছে যেন এই মাত্র জেনে নিতে, কেন এই আগমন। মানবের সাহায্যেই স্রষ্টা জানতে পারে নিজেকে। এই অগ্রগতিই বিবর্তন। মানবের যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মজ্ঞানের প্রক্রিয়া যার সহচর।

পৃথিবীতে সম্ভবত এমন দুর্ভাগা মানুষ একজনও নেই যে এই প্রক্রিয়ার আঁচ পায়নি। মানবজাতির ভাঁড়ারে সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় ভাগ বসায় প্রত্যেকেই। আর প্রতিবার প্রত্যেকের কাছে আত্মোপলব্ধির নিত্য নতুন দরজা খুলে যায়। অসম্পূর্ণ, অভাব—তাড়িত, অপর্যাপ্ত 'আমি'—ই মানুষের যন্ত্রণা ও অসন্তোষের এক অনন্ত উৎস। ব্যক্তি মানুষের লক্ষ একটাই, আত্মিক ও নৈতিক

আত্মোপলব্ধি। নিজের বাইরে ব্যাপ্ত বিপুল বিশ্বের সঙ্গে বার বার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে চলে পীড়িত মানবাত্মা। অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণের স্পর্শ চায়।

বিজ্ঞানের মতো শিল্পও এক অর্থে এমন এক দুর্লভ পন্থা যার সাহায্য 'অমোঘ সত্যে'র দিকে মানুষের যাত্রা পরিচালিত হয়। জ্ঞানের এক হাতিয়ার বিশেষ। তবে বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্যেরও ইতি এখানেই। এরপরই পৃথক হয়ে যায় তাদের পথ। মানবের সৃজন ক্ষমতার এই দুই প্রতিমূর্তির সাহায্যে শুধু অবিষ্কার নয়, মানুষ সৃষ্টিও করে। বৈজ্ঞানিক ও নান্দনিক সত্যের মধ্যে তফাতের, স্বাতন্ত্র্যের এই ক্ষেত্রটিকে স্মরণ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানে মানুষের জ্ঞানের গতি পর্যায়ক্রমিক। চলে একের পর এক সিঁড়ি ভেঙে। এই সিঁড়ি অন্তহীন, সামনে। নতুন জ্ঞান সব সময়ই তাকে বদলে দেয়। পালটে যায় পুরনো ছবি। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে, পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের আবিষ্কার আগেকার জ্ঞানকে, সত্যকে বাতিল করে, প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়।

শৈল্পিক প্রতিটি আবিষ্কার জগতের নতুন, অনন্য চিত্র উপস্থিত করে। পরম সত্যের সাঙ্কেতিক চিত্রের মতো। এ যেন এক উদ্ঘাটন। এক মুহূর্তে, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো বিশ্বের সত্যাবলি উপলব্ধির এ এক উন্মত্ত বাসনা। বিশ্বের সৌন্দর্য, কদর্যতা, সমবেদনা তার অসীমতা এবং তার সীমাবদ্ধতা—সব, সমস্তই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যেন। পরম সত্যের অনন্য উদ্ঘাটক স্বরূপ মানস প্রতিমা (চিত্রকল্প) সৃষ্টি করে শিল্পী এই ভাব প্রকাশ করেন। অসীমের চেতনা ধরা থাকে ঐ মানসপ্রতিমায়। সসীমের মধ্যে চিরন্তন। বস্তুর মধ্যে চিন্ময়, পরমার্থ। সীমাহীনকে রূপের সীমার মধ্যে এনে ফেলা।

শিল্প বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাবাদী কার্যধারার জন্য পরম আধ্যাত্মিক সত্য আমাদের অগোচরে থেকে যায়; এই প্রতীক সেই সত্যের সঙ্গে যুক্ত।

বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করতে হলে ব্যক্তিকে চিন্তার যৌক্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। একেবারে শুরুতেই তাকে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বিশেষ ধরণের শিক্ষা পেতে হবে। শিল্পের সম্ভাষণ সকলের প্রতি। সংক্ষোভ জনিত ক্ষতের কারণ হয়ে ওঠা, যাতে তাকে (শিল্পকে) অনুভব করা যায় সেই রকম ছাপ রেখে যেতে চায় সে। অকাট্য যুক্তির পথে নয়। অধ্যাত্ম শক্তির মাধ্যমেই শিল্পী এই অসাধ্য সাধন করেন। শিল্প কর্মে অধ্যাত্ম শক্তির প্রবেশ ঘটিয়ে।

যেখানেই সময়হীন, অধ্যায়ের জন্য, আদর্শের জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্খা রয়েছে শিল্প সেখানেই জন্ম নেয়। অস্তিত্বের অর্থ অনুসন্ধানের পথ পরিত্যাগ করে আধুনিক শিল্প ভুল পথে মোড় নিয়েছে। ব্যক্তির মূল্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই এটা ঘটেছে। আধুনিক শিল্পের মর্মার্থ বলে যা প্রকাশিত হচ্ছে বস্তুত তা যেন শুরু থেকেই সন্দেহভাজন কিছু চরিত্রের উদ্ভট আচরণ মাত্র। তাঁদের ধারণা ব্যক্তিক আচরণ মাত্রেই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু। শিল্প যেন ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার এক প্রদর্শনী। শিল্প সৃষ্টিতে কিন্তু ব্যক্তি নিজেকেই শুধু স্পষ্ট, নিশ্চিত করে তোলে না অন্য এক ধারণা, গোষ্ঠীগত উচ্চতর এক আদর্শের সেবায় সে নিযুক্ত।

শিল্পী সর্বদাই সেবক। অলৌকিক ভাবে সে যে বর পেয়েছে। অনন্তকাল সেই প্রাপ্তির ঋণ চুকিয়ে চলেছে। আধুনিক মানুষ অবশ্য কোনওরকম ত্যাগ স্বীকার করতে চায় না। যদিও ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃত অর্থে সুনিশ্চিতভাবে প্রকাশ করতে পারে একমাত্র ত্যাগের পথেই। ক্রমশ আমরা ভুলে যাচ্ছি একথা এবং সেই সঙ্গে হারিয়ে ফেলছি মানবিক ব্রতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ……

সৌন্দর্যের প্রতি, আদর্শের প্রতি আকুতি শিল্পের চূড়ান্ত লক্ষ, সত্যম শিবম সুন্দরমের কথা বললেও আমি একবারও একথা বলছি না শিল্পে জাগতিক 'কলুষ' এড়িয়ে চলতে হবে। তাকে বর্জণ করতে হবে। বরং তার উল্টোটা। শিল্প প্রতিমা রূপক। বিকল্প সৃষ্টি করে সে। একের স্থান দখল করে অন্য। ক্ষুদ্রতরের স্থান নেয় মহত্তর কিছু। জীবন্ত কোনও কিছুকে বোঝাতে শিল্পী হয়ত বেছে নিলেন মৃত কোনও কিছু। অসীমের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হল সসীমের মধ্যে। বিকল্প রচনা ··· অসীমের বস্তু রূপায়ন অসম্ভব। যদিও সেই অসীমের মায়া সৃষ্টি তার প্রতিমা নির্মাণ অসম্ভব নয়।

প্রচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য পরস্পরের মধ্যে একই আধারে রয়েছে। এই অত্যাশ্চর্য স্ববিরোধ তার আজগুবির ডালি জীবনেও বিস্তারিত। সমন্বয় এবং টানাপোড়েন একীভূত হতে পারে এমন এক সমগ্রতা শিল্পে রচিত হয়। বহুস্তরের বিবিধ উপাদান সেখানে সংস্পর্শী—শিল্পপ্রতিমা বৈচিত্রের ঐক্যকে স্পন্দিত করে তোলে, তাকে প্রায় স্পর্শের আওতায় নিয়ে আসে।

শিল্প প্রতিমার ধারণা, তার অন্তর্বস্তুর বিবরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এই ব্যাখ্যা বিবরণ কখনওই পর্যাপ্ত হতে পারে না। প্রতিমা কেবল নির্মাণ করা চলে এবং তাকে অনুভবযোগ্য করে তোলা যায়। তা গৃহীত কিংবা বাতিল হতে পারে। কিন্তু মেধা দিয়ে কিছুতেই তাকে বোঝা যাবে না। অনন্তের ধারণা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার কোন বিবরণও পেশ করা যায় না। একমাত্র

শিল্পের মাধ্যমেই তা অনুধাবন করা চলে। শিল্পই তাকে স্পর্শনীয় করে তোলে। বিশ্বাস নির্ভর হয়ে, সৃজনশীল কাজের মধ্যেই পরমকে অর্জণ করা সম্ভব।

সেবার জন্য প্রস্তুতি, আপোসে আপত্তি এবং নিজের ব্রতে বিশ্বাস সৃজন অধিকার অর্জণের শর্ত। শৈল্পিক সৃষ্টির দাবি হল শিল্পী নিজেকে ধ্বংস করবে। সম্পূর্ণরূপে। সুতরাং শিল্পের মধ্যে পরম সত্যের কোন সাঙ্কেতিক চিত্র থাকলে তা হবে বিশ্বেরই এক মানস প্রতিমা। শিল্পকর্মে প্রকাশিত এই প্রতিমা সর্বকালীন। শিল্পে বিজ্ঞানের মতো পর্যায়ক্রমিক সিঁড়ি গড়ে ওঠে না। স্বতন্ত্র, অনন্ত ক্ষেত্র রচিত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্র শুদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি অপরটির পরিপূরক বা বিরোধী হতে পারে কিন্তু কেউই কাউকে বাতিল করে দিতে পারে না। বরং পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে। সর্বব্যাপক একটি ক্ষেত্র রচনা করে। অনন্তের গর্ভে যার জন্ম। চিরকালীন ও যথার্থ এই কাব্যিক প্রকাশ মানুষের ক্ষমতারও সাক্ষ্য। কার আদলে কার মতো সে ভাবে, অনুভব করে, সেই অনুসারে সাড়া দেয় মানুষ—স্বীকার করে নেয় কোনও বিশেষ শিল্পকর্ম।

শৈল্পিক সৃজনশীলতার গুরুত্বপূর্ণ, অন্যতম একটি দিক হল সংযোগস্থাপন। পার্থিব অর্থে বিজ্ঞানের মতো শিল্পের কোনও বাস্তব লক্ষ নেই। ব্যবহারিক মূল্য, বাস্তব উদ্দেশ্যসাধন—এসব কিছু নেই। শিল্পের ভাষা বৈচিত্রময়, রূপকধর্মী। মানুষ এই ভাষার সাহায্যে প্রাণের কথার আদান প্রদান করে। তবে কোনও বাস্তব সুবিধালাভের জন্য নয়। ভালবাসার আদর্শ উপলব্ধির জন্য। আত্মদানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সে ভালাবাসার অর্থ। বাস্তববাদের একেবারে বিপরীত মেরুর বস্তু এই ত্যাগ। আমি বিশ্বাসই করতে পারি না একজন শিল্পী কেবল 'আত্ম-প্রকাশের' জন্য কাজ করতে পারেন। কোথাও অনুরণন, সাড়া সৃষ্টি করতে না পারলে আত্মপ্রকাশ অর্থহীন। অন্যদের সঙ্গে অধ্যাত্ম-সম্পর্কে বিজড়িত হওয়ার এক যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া হতে পারে বড় জোর। এর মধ্যে বাস্তব লাভালাভ কিছু নেই। এবং এদিক থেকেও শেষ পর্যন্ত এ কেবল তা ত্যাগই। শুধু নিজের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য এতখানি ঝুঁকি, এই বলিদান কেউ বেছে নিতে পারে না।

বিজ্ঞান এবং শিল্পে অবধারণের অর্থ এক নয়। এই দুটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জিনিসকে চিহ্নিত করা হয় 'বোঝা' এই শব্দটির দ্বারা। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এর অর্থ যৌক্তিক স্তরে,, বুদ্ধির স্তরে সহমত হওয়া ; একটি তত্ত্ব প্রমাণের প্রক্রিয়ার মতোই মননশীল কোন কাজ।

শিল্প প্রতিমা অবধারণের অর্থ আবেগ অনুভূতির স্তরে সুন্দরের বরণ। নান্দনিক অর্থে তাকে গ্রহণ করা।

তফাত আরও আছে, বৈজ্ঞানিকের প্রেরণা আর শিল্পীর প্রেরণা এক নয়। যদিও মনে হতে পারে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রেরণার ফল।

কী ভাবে শিল্পপ্রতিমার জন্ম হয় মননের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। অনন্য ও অবিভাজ্য এই চিত্রকল্প মননের স্তরে নয় অন্য কোনও স্তরে সৃষ্ট হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের মুহূর্তে যুক্তির স্থান নেয় বোধ। শিল্পে ধর্মের মতোই বোধের সমতুল্য হল বিশ্বাস। এ হল মনের এক বিশেষ অবস্থা, চিন্তা-প্রক্রিয়া নয়। বিজ্ঞান একান্তভাবেই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নির্ভর। চিত্রকল্প বা শিল্পপ্রতিমা নিয়ন্ত্রিত হয় উদ্‌ঘাটনের গতিময়তায়। আকস্মিক ঔজ্জ্বল্যের বিদ্যুৎ চমক, বা হঠাৎ আলোর ঝলকানি। এ এক আচমকা উদ্ভাসন। যাতে সমগ্র, অনন্ত ধরা দেয়। সচেতন চিন্তার মধ্যে এই ব্যাপ্তি, এই আশ্চর্য বিস্ফোরণ ধরে না। সচেতন চিন্তার পরিসর অত বৃহৎ নয়।

শিল্পের চিন্তা যুক্তি অনুসরণ করে না, বা তার আচরণকে যুক্তির মালায় গেঁথে নেয় না। সে তার নিজের বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সত্যকে বিরুদ্ধ পক্ষের সামনে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে যথার্থ বলে তুলে ধরা সম্ভব। শিল্পী কিন্তু কখনই প্রমাণ করতে পারেন না তিনিই সঠিক। শিল্পী যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন তাতে যদি কেউ সাড়া না দেন, নির্বিকার থাকেন, যদি সেই চিত্রকল্প কারও হৃদয় জয় করতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে শিল্পী অসহায়। শিল্পে আবিষ্কৃত জগৎ সম্পর্কিত সত্য বহন করছে যে শিল্পকর্ম তার মুখোমুখি হয়ে দর্শক, শ্রোতা এবং পাঠক এমনকী ক্লান্তও বোধ করতে পারেন। একঘেঁয়ে লাগতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা লেভ তলস্তয়ের কথা স্মরণ করতে পারি। বিশেষ করে তলস্তয়ের সেইসব রচনা যেখানে নৈতিক প্রেরণা থেকে তিনি তাঁর ভাবাদর্শ প্রকাশের জন্য খুব সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট মিতকথনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। এইসব রচনা কী ভাবে রচয়িতার বিরোধিতা করেছে আমরা দেখতে পাই। লেখকের আদর্শবাদী পাঁচিল আরও ভেঙে ফেলেছে, একের পর এক। লেখকের চাপিয়ে দেওয়া কাঠামোর মধ্যে শিল্পপ্রতিমা নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি। তাকে ছাপিয়ে, নস্যাৎ করে বিরাট হয়ে উঠেছে এই সব রচনা। এমনকি কখন কখন কাব্যিক অর্থে নিজেদের যৌক্তিক অবয়বের বিরোধিতা করেছে। সেইসব মহান শিল্পকর্ম

দীর্ঘ জীবন পেয়েছে, বেঁচে আছে আজও। এইসব রচনার নান্দনিক এবং হৃদয়গ্রাহী বিপুল গভীর প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারি না, যদিও লেখকের মূলতত্ত্ব মেনে নিতে পারছি না। প্রায়শই দেখা যায় শিল্পীর নিজের দুর্বলতা অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই জন্ম নিচ্ছে এক মহৎ শিল্পকর্ম। দুর্বলতা অতিক্রমের এই চেষ্টায় শিল্পী যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন এমনও নয়। শিল্পকর্মের মধ্যে তাদের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। দুর্বলতার চিহ্নগুলি থাকা সত্ত্বেও শিল্প রূপ পরিগ্রহ করেছে, গড়ে উঠেছে। থেকে গিয়েছে দাগ, ফাটল।

শিল্পী তাঁর জগৎ প্রকাশ করেন আমাদের কাছে। আমাদের বাধ্য করেন হয় তা বিশ্বাস করতে অথবা অপ্রাসঙ্গিক অবিশ্বাস্য বলে বর্জন করতে। শিল্প-প্রতিমা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নিজের চিন্তাকে গৌণ করে তোলেন, তাকে বশে রাখেন শিল্পী। বিশ্বের যে চিত্রকল্প উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আবেগমথিত উপলব্ধিতে তার কাছে নিজের চিন্তা তুচ্ছ, খড়কুটো মাত্র। চিন্তা হ্রস্বতর, সংক্ষিপ্ত। শিল্প-প্রতিমা সীমাহীন, সমগ্র। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পকর্মের এই এক জায়গায় সাদৃশ্যের কথা কেউ বলতে পারেন। শিল্পের প্রভাব আত্মায়, আত্মার অধ্যাত্ম কাঠামো গড়ে দেয় সে।

কবির কল্পনা ও মনস্তত্ত্ব শিশুর। জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা যতই গভীর হোক না কেন, শিশুর মতোই জগতের ছবি তার কাছে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষতায় উপস্থিত। অবশ্য শিশু সম্পর্কেও কেউ দার্শনিক আখ্যা দিতে পারেন। তবে তা খুবই আপেক্ষিক অর্থে। এবং দার্শনিক ধারণার মুখোমুখি হওয়া মাত্র শিল্প অদৃশ্য হয়। কবি কখন জগৎ 'বর্ণনা' করেন না বরং জগৎ সৃষ্টিতে তাঁরও হাত আছে।

শিল্পীর উপর আস্থা রাখতে পারলে, তাঁকে বিশ্বাস করতে পারলেই ব্যক্তি শিল্পের ব্যাপারে সংবেদনশীল, শিল্প অনুরাগী হতে পারেন। কখন কখন কাব্য প্রতিমার সঙ্গে এমন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকে যে সেই ব্যবধান অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। একই ভাবে ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস রাখা, সেই বিশ্বাসের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেও ব্যক্তিকে আত্মার বিস্তার ঘটাতে হয়। এ এক ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তি।

যাঁরা সত্য অন্বেষণ করেন না, তাঁদের চোখের সামনে থেকে সুন্দরকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সুন্দর তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে না। এঁরা শিল্পকার্যের দিকে একনজর তাকিয়েই তার নিন্দা করেন। অধ্যাত্ম শক্তির গভীর অভাব রয়েছে এঁদের মধ্যে। কোন উচ্চতর অর্থে নিজেদের অস্তিত্বের অর্থ ও লক্ষ্য সম্পর্কে

জানতে তাঁরা প্রস্তুত নন, ইচ্ছুকও নন। শিল্প সম্পর্কে তাঁদের স্থূল, কদর্য সরলীকৃত কৃত মন্তব্য—'আমার ভাল্লাগে না, অ্যাতো বোরিং'। এটা আসলে একটা মুখোসও বটে, সত্য সম্পর্কে অনীহা, অনাগ্রহ গোপন করতেই এই কদর্য চিৎকার।

এখন, এ নিয়ে তর্ক চলেনা। এ যেন এক জন্মান্ধকে রামধনুর কথা বলা। শিল্পী যে সত্য উপলব্ধি করেছেন অন্যকে তিনি তার ভাগ দিতে চান। এ জন্য তাঁকে যে বেদনা সহ্য করতে হয় সেই বেদনার বিবরণ শোনার মতো কান স্থূল দৃষ্টিভঙ্গির মানুষের নেই। তাকে এসব কথা বলার অর্থ বধিরের কানে অমৃত বর্ষণ।

কিন্তু সত্য কী?

আমার মনে হয় আমাদের কালে সবচেয়ে দুঃখের দিক হল, সৌন্দর্য বিষয়ে মানুষের সমস্ত সচেতনতার সামগ্রিক বিনাশ। আধুনিক গণ-সংস্কৃতি ভোক্তা উৎপাদন করে জনসাধারণের আত্মাকে পঙ্গু করে চলেছে, মানুষ ও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে পাঁচিল তুলছে। নিজের সম্পর্কে মানুষের চেতনা, তার আত্মিক উপলব্ধি, অধ্যাত্ম চেতনাকে আড়াল করছে। সত্যের আহ্বানে শিল্পী সাড়া না দিয়ে পারেন না। সত্যই শিল্পীর সৃজনী বাসনার একমাত্র ব্যাখ্যাকর্তা। অন্যদের কাছে তিনি তাঁর বিশ্বাস প্রকাশ করেন, সঞ্চারিত করেন অন্যদের মধ্যে। যে শিল্পীর বিশ্বাস নেই তিনি যেন এমন এক চিত্রকর, জন্মলগ্নেই যিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

শিল্পী 'বিষয়ের' অনুসন্ধান করছেন—এরকম কথা বলা ভুল। বিষয় একটি ফলের মতো শিল্পীর মধ্যে জন্ম নেয় এবং তা দাবি করতে থাকে প্রকাশ। শিশুর জন্মের মতো, প্রসবের মতো···তবে এতে কবির গর্বের কিছু নেই, এই পরিস্থিতির প্রভু নয় কবি। সে একজন সেবক মাত্র। দাস। তার একমাত্র সম্ভাব্য অস্তিত্ব হল সৃজনশীল কাজ।···

... ...

আদর্শ প্রচার শিল্পের কাজ নয়। শিল্পের লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা, তার আত্মাকে উর্বর করে তোলা যাতে মঙ্গলের দিকে শুভের দিকে ফেরার যোগ্য হয়ে ওঠে সে।···

মহান শিল্পকর্ম বিচারের কিছু স্থায়ী নিরিখ রয়েছে। চারপাশের অন্যান্য সব কিছু থেকে এসবের সাহায্যেই যেন তাকে স্বতন্ত্র করা হয়ে থাকে। যদিও মিলনস্বরের এক স্বরসঙ্গতি ছাড়া সাধারণভাবে মহান শিল্পকর্ম সম্পর্কে কিছু বলা

আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। উপরন্তু একটি বিশেষ শিল্পকর্মের মূল্য অনেকটাই নির্ভর করছে যাঁরা তার রসাস্বাদন করছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ; সমাজের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্কের উপর অনেক সময় যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেখানে একটি স্ববিরোধ রয়েছে। এই গুরুত্ব যেন গ্রহীতাকেই শিল্পের শেষ কথায় পর্যবসিত না করে। গ্রহীতাকে রসজ্ঞ হতে হবে। শিল্পকর্মের মধ্যে নিহিত সর্বজনীন ও বিশেষের তত্ত্বগুলি অনুধাবন করতে হবে তাঁকে। মানব ব্যক্তিত্ব ও বাস্তবের সম্পর্ককে জুড়ে নিতে হবে তাঁকে। সে সম্পর্ক ব্যক্তিগত। নির্বিশেষ এবং বিশেষ। গ্যেটে যেমন বলেছিলেন, একটি ভাল বই রচনা করার থেকে তা পড়তে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন কাজ। সমালোচনার কাজ অনেকটাই—বিশেষ কোনও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিল্প থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া, তাকে ব্যবহার করা। সরাসরি, একেবারে শিল্পটি থেকে, আলোচ্য শিল্পের আবেগ—অনুভূতির জায়গা থেকে কদাচিৎ সমালোচনা শুরু হয়ে থাকে। শিল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণায় পৌছতে হলে, মূল শিল্পটির রসগ্রহণের জন্য অসাধারণ ক্ষমতা থাকা দরকার। প্রয়োজন স্বাধীন, কলুষমুক্ত বিচারবোধ। নিজেদের মত পাকা করার জন্য সাধারণত লোকে আশেপাশে তার সমর্থন খোঁজে, আলোচ্য শিল্পকর্মটির সমজাতীয়, পরিচিত দৃষ্টান্ত খোঁজে। ব্যক্তিগত আকাঙ্খা, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী শিল্পকর্মটির মূল্যায়ন শুরু করে। এভাবে হাজারটা মত বর্ষিত হল যার উপর, সেই শিল্পকর্মটির অস্তিত্ব এতে ম্লান হয় না বরং তার ব্যাপ্তি বেড়েই যায়। থোরিউ যেমন তাঁর আশ্চর্য গ্রন্থ ওয়ালডেনে বলেছেন ঃ মহান কবিদের সৃষ্টি মানবজাতি কখনই পড়েনি। একমাত্র মহান কবিরাই তা পড়তে পারেন। অসংখ্য মানুষ যেভাবে আকাশের তারা পর্যবেক্ষণ / পাঠ করেন, জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক থেকে, জ্যোর্তিবিজ্ঞানের দিক থেকে নয়। সেভাবেই অসংখ্য মানুষ এই সাহিত্য পাঠ করেছেন। পাঠের মধ্যে যে মেধার মহান চর্চা রয়েছে তাঁরা সে কথা জানেন না। অধিকাংশের কাছে এ এক অলস বিলাসমাত্র। ...

শিল্পী তাঁর কাজে গভীরভাবে একাগ্র না হলে মহান শিল্প সৃষ্ট হয় না। আগ্নেয়গিরির কাছেই খুঁজতে হয় হীরে। সৌন্দর্যের সব থেকে কাছে পৌছনোর এই যাত্রা শিল্পীর পক্ষে সম্ভবই নয় যদি তাঁর নিষ্ঠা আংশিক হয়। সৌন্দর্যের পরম রূপই শিল্প। শুদ্ধির শেষ কথা।

প্রাণের মতোই শিল্প বেঁচে থাকে। বেড়ে ওঠে। পরস্পরবিরোধী সূত্রের সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে। এইসব সূত্র পরস্পরের সঙ্গে এক মেলবন্ধন সৃষ্টি করে।

স্পর্শ করতে চায় অসীমকে। এ কারণেই শিল্পের কোন একপেশে ব্যাখ্যা হয় না। তা যেন এক অনন্ত বিশ্ব। গ্যেটে যেমন বলেছিলেন, 'মেধা দিয়ে যে শিল্প যত কম বোঝা যাবে সেটি ততই মহৎ শিল্প।' এই ধরনের শিল্পে বহু অনুষঙ্গ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা লীন হয়ে যায় একে। বহু হয়ে ওঠে এক।*··· □

*আন্দ্রেই তারকোভস্কির 'স্কাল্পটিং ইন টাইম' গ্রন্থের একটি নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই প্রবন্ধটি।—সম্পাদক।

Space donated by :

Phone : 274342

SELCONS

Distributors : Tata Oil Mills Company Limited
Geoffrey Manners Limited

4/1B, Nirmal Chandra Street
Calcutta-12

Space Donated by :

Phone : 57-4450

M/s. S. D. Builders

All kinds of buildings material supplier.

NAYA PALLY ROAD
Calcutta-700 055

The Joy of Energy

We try to give it to all those who labour with us to give the nation its most Important & Economical Commercial Energy Resource – Coal. More and more is being done to improve The Living & Environmental conditions of the Miners who work day in and day out to keep the wheels of the Economy moving.

COAL INDIA LIMITED

10, NETAJI SUBHAS ROAD

Calcutta-700 001

ভাস্কর রায়

পুনর্লিখনে স্যাক্রিফাইস

আমাদের মনোজগতে প্রতিনিয়ত যে শব্দ পড়ে তার কোন পরম্পরা নেই, যেমন নেই দৃশ্যবস্তুর সুসংহত বিন্যাস। এই-সবের প্রকৃত নিয়ন্তা স্মৃতি যা আদতে 'বিস্মরণের' সুবিশাল সৌধ। যে মানুষের দৃষ্টি তার দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে যায় না স্মৃতি তার কাছে কোন জগত তৈরি করেনা। সে প্রাত্যহিকতার ভারে পীড়িত, ফলে নিরালম্ব। আমাদের যা কিছু গভীরতম, যা তাৎক্ষণিকের প্রয়োজনে ক্ষয় হয়না, তার সবটাই 'বিস্মরণের' অমোঘ প্রক্রিয়ায় স্মৃতির আধারে জমা পড়ে। কবিতা স্মৃতি-অনুগামী, স্বপ্নের মতোই আকস্মিক এর 'বিস্ফোরণ'। 'নগ্ন নির্জন হাত'—কথাটির কোন আক্ষরিক অর্থ করা যায় না, কারণ কবিতার পরিমণ্ডল তৈরি হয় অনুভূতির অনুষঙ্গে যা স্মৃতি-স্বপ্ন উৎসারিত। তারকোভস্কি কবিতার এই অন্তর্নিহিত সত্বাটিতে পান চলচ্চিত্র-ভাষার মূল সূত্র। চলচ্চিত্রের সাঙ্গীতিক কাঠামোর কথা অনেকেই বলে থাকেন যেহেতু সুরের মতো চলচ্চিত্রের চিত্রকল্পও গড়ে ওঠে প্রত্যক্ষ বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে। এই প্রত্যক্ষ বাস্তবের যথাযথ পরিবেশনেই সৃষ্টি হয় চিত্রকল্পের অমেয় পরিধি, আর এখানেই কবিতার সঙ্গে চলচ্চিত্রের মিল।

মহৎ কবিতা যেমন কেবল বুদ্ধি-গ্রাহ্য নয় তেমনি মহৎ চলচ্চিত্রও নয়।

গত দু-দশক ধরে চলচ্চিত্র-সমালোচনার যে কটি ধারা চালু হয়েছে সেগুলিকে আমরা মূলত চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন, মার্ক্সীয় বিশ্লেষণাত্মক, ভাষাতাত্ত্বিক (সেমিওলজিকাল), স্ট্রাক্চারালিস্ট এবং মনস্তাত্ত্বিক যা লাকাঁর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। শেষোক্ত তিনটিরই সাধারণ ভিত্তি ভাষাতত্ত্ববিদ্যা। চলচ্চিত্র সমালোচনায় এই চারটি ধারারই ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে এগুলি শেষপর্যন্ত একটি বিশেষ ছবির মূল্যায়নের পরিবর্তে কতগুলি সাধারণ তত্ত্বের আলোচনাতে পর্যবসিত হয়। যেমন ধরা যাক স্ট্রাক্চারালিস্ট বিশ্লেষণের পদ্ধতিটি। এর বিচারে 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিটি মূলত একটি নীতিকথা (প্যারাবল) যেমন যিশু খ্রীস্টের জীবন কাহিনী একটি নীতিকথা। এই নীতিকথার মূল বাণী, মানুষের মুক্তি আনতে পারে একমাত্র ব্যক্তির আত্মাহুতিই (স্যাক্রিফাইস)। সিদ্ধান্তটি ছবিটির ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য। কিন্তু এ ধরণের আলোচনা থেকে আমরা কোন সূত্রই পাইনা—কেন এই নীতিকথা অন্যান্য নীতিকথা, যেমন ঈশপের নীতিকথা থেকে ভিন্ন।

স্ট্রাক্চারালিস্ট পদ্ধতিটি অন্যান্য বিষয়ের মতোই ছবিকেও একটি পাঠবস্তু (টেক্সট) বলে ধরে। এই পদ্ধতিটির আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে ওই পাঠ-বস্তুতে বিভিন্ন 'কোডের' পাঠ-উদ্ধারে (ডিকোডিং)। 'কোড'-গুলি সাধারণত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক হয়ে থাকে এবং পাঠবস্তুকে জড়িয়ে থাকে। 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিতে অনেকগুলি 'কোড'ই আবিষ্কার করা যায়, তবে এগুলির পাঠোদ্ধার আমাদের বলে না কীভাবে ছবিটি একটি সরল নীতিকথার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে জটিল শি-রূপ নেয়।

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির বিশ্লেষণে আলেকজাণ্ডারের আত্মোৎসর্গ আসলে তার মর্ষকামিতারই চূড়ান্ত পরিণতি। আলেকজাণ্ডারের আত্মত্যাগের সৃষ্টিশীল দিকটিই এ-আলোচনা থেকে বাদ পড়ে। আত্মোৎসর্গ বস্তুত ভালোবাসারই অভিব্যক্তি। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'স্যাক্রিফাইসের' মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভোগবাদী সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রতিবাদ নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রতিবাদ বলতে যে-অর্থে মার্কসবাদীরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা বোঝে এটি তার বিপরীত মেরুতে। মানুষের নৈতিক পুনরুত্থানই এই প্রতি-বাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং সামাজিক পরিবর্তন একমাত্র একে কেন্দ্র করেই হতে পারে। তাছাড়া তারকোভস্কি ব্যক্তির একক প্রচেষ্টাতেই তার কর্মের শুদ্ধতা খুঁজে পান। গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। আমাদের এ লেখার উদ্দেশ্য নয় কোন তত্ত্বের অবতারণা যদিও কিছু তত্ত্বের উল্লেখ

অনিবার্য। কবিতা যেমন চলমান জগতের প্রতিমূর্তিমাত্র এবং ফলত রহস্যময় ও দ্ব্যর্থবোধক এবং সেই কারণে অনন্যসৃষ্টি, তেমনি তারকোভস্কি তাঁর 'স্যাক্রিফাইস' ছবিতে যে অনন্য জগত সৃষ্টি করেছেন আমরা পারি শুধু এরই অসংখ্য প্রতিমূর্তি গড়তে।

প্রাচীন গ্রীকদের কাছে সময়ের ক্রমিক অগ্রগতির কোন অর্থ ছিল না। আরিস্ততল বিশ্বাস করতেন না তিনি পিউনিক যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাস করছেন। মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে, একটি পূর্বনির্ধারিত চরম লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে এমন ধারণা মূলত জুডিও-খ্রীস্টীয়, গ্রীক দর্শনে এর কোন স্থান ছিল না। সময় একই জায়গায় বারবার ফিরে আসে, জগত অন্তহীন আবর্তনের প্রক্রিয়ায় বারবার একই রূপ পরিগ্রহ করে—এই ভাবনাটি হিরাক্লিতাসের দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। নীট্‌শের 'অন্তহীন আবর্তনের' তত্ত্বটি হিরাক্লিতাসের এই দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'স্যাক্রিফাইস্' ছবির প্রথম দৃশ্যেই এই দার্শনিক তত্ত্বের কথা উচ্চারিত হয়। অটোই এই তত্ত্বটির প্রসঙ্গ তোলে। ছবিটির জটিল বিন্যাসে অটো চরিত্রটি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। অটো যেমন একদিকে আলেকজাণ্ডারেরই অন্য সত্তা তেমনি একই সঙ্গে ছবিটির রহস্যময়তারও দ্যোতক। চরিত্রটি গড়ে ওঠে আলেকজাণ্ডারের সমান্তরালে, অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের পরিভাষায় যেটিকে বলা হয় 'কাউণ্টারপয়েন্ট'। এই অটোই নীট্‌শে-প্রণীত 'জরাথুস্ত্রের বাণী'তে উল্লেখিত বামনের কথা বলে, যে বামন প্রাজ্ঞ জরাথুস্ত্রকে পরাভূত করেছিল। এই উপাখ্যানটি বইটির 'স্বপ্ন ও হেঁয়ালি' পরিচ্ছেদে রয়েছে। বামন জরাথুস্ত্রকে বলছে, 'কোন সত্যের পথই সরল নয়; সময় আসলে বৃত্তাকার' সৃষ্টি বার বার নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে, প্রতিবারই রহস্যের আড়ালে স্ব-রূপকে লুকিয়ে রাখে। আমরা কেবল পারি বার বার এর সঙ্গে মিলতে, বার বার এর প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে। অন্যভাবে বলতে গেলে শিল্প সৃষ্টির অন্তিম লক্ষ্যও তাই। অটো আসলে হেঁয়ালির ছলে এই পরম সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করে। আলেক-জাণ্ডার তো কথার ভারে ন্যুব্জ। 'কথা, কথা আর শুধু কথা, এখন আমি বুঝতে পারি হ্যামলেট কী বলতে চেয়েছিল'। অর্থাৎ কথা শেষ পর্যন্ত আত্মরতিমাত্র, আলেকজাণ্ডার ক্রমাগত আত্মার এই শব সাধনায় ক্লান্ত। অটোর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতকে সে তত্ত্বকথা বলেই ধরে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আলেকজাণ্ডারের এক চরম সংকটের মুহূর্তের জন্য, এক অমোঘ 'বিস্ফোরণের' জন্য যা কবিতারই আরব্ধ কর্ম, স্বপ্ন বাস্তব যেখানে একাকার হয়, স্বপ্ন যেখানে এক দৈব প্রত্যাদেশের

ভূমিকা নেয়। অটোই এই 'বিস্ফোরণের' নিয়ন্তা।

ছবি শুরু হয় লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা 'অ্যাডোরেশন অফ দি মেজাই' তৈলচিত্রটি দিয়ে। 'মেজাই' অর্থ প্রাচ্যদেশের তিন প্রাজ্ঞপুরুষ যাঁরা বেথেলহেমে সদ্যোজাত যিশুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে এসেছিলেন। ছবিটির বিষয়বস্তু 'ন্যাটিভিটি' অর্থাৎ মানবত্রাতা যিশুর আবির্ভাব উপলক্ষে পালিত উৎসব। লিওনার্দোর এই চিত্রটি 'স্যাক্রিফাইস্' ছবির একটি প্রধান উপাদান। লিওনার্দো তাঁর এই ছবিতে 'ন্যাটিভিটির' থিমকে এক ব্যাপক অর্থ দিয়েছেন। গাছের নীচে যিশুকে কোলে নিয়ে মাতা মেরি উপবিষ্ট, যিশুর এক হাত প্রাজ্ঞপুরুষদের একজনের হাত থেকে পানপাত্র নিতে প্রসারিত, যিশুর পায়ে প্রণত যিশুর পিতা যোসেফ ও এক প্রাজ্ঞপুরুষ, মেরি ও যিশুর দু'পাশে অন্য দুইজন, মুখে তাদের বিষণ্ণতা, চারপাশে কোন এক রহস্যময় কারণে উত্তেজিত জনতা ও ত্রস্ত মেষপালকের দল, পেছনে আবছা আলোর পটভূমিতে যুধ্যমান কিছু অশ্বারোহীর অস্পষ্ট অবয়ব, বাঁ-পাশে এক বিধ্বস্ত প্রাসাদ যার সিঁড়ি দিয়ে কিছু ছায়ামূর্তি-সদৃশ মানুষ দ্রুত ওঠানামায় ব্যস্ত, প্রাসাদের চত্বরে অসম্পূর্ণ অবয়ব, অশরীরী মানুষ যেন তারা অন্ধকারের জগত থেকে সদ্য-নিষ্ক্রান্ত, গাছের পেছনে বন্য ঘোড়ার ক্রুদ্ধ আস্ফালন, প্রাসাদের সামনে অশ্বারূঢ় এক যোদ্ধা, বাঁ-পাশে ফ্রেমের নীচে দার্শনিক গভীর চিন্তায় মগ্ন, ডানপাশে ফ্রেমের নীচে এক সুন্দর যুবক, তার দৃষ্টি দৃশ্যটি থেকে অবজ্ঞায় অন্যদিকে ফেরান—এই সবের সন্নিবেশে গোটা ক্যানভাসব্যাপী এক আধো-অন্ধকার রহস্যময় স্বপ্ন-সদৃশ পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। অশ্বের হ্রেষা, অস্ত্রের ঝংকার, ক্লিষ্ট মানুষের আর্তনাদে পৃথিবীতে এক অদ্ভুত আঁধার নেমে আসে—সভ্যতা যেন অন্তিম বিনাশের প্রতীক্ষায় থমকে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে যিশুর আবির্ভাবে যে মুক্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে, বিভ্রান্ত, ক্লিষ্ট মানুষ এর অর্থ বুঝতে পারে না, ফলে আতঙ্ক আর আশঙ্কা আলোড়িত। সুন্দর যুবকটি রেনেশাসের মানুষ, বুদ্ধি ও মননের প্রতিভূ। এই ঐশী ঘটনা তার কাছে নিতান্তই অবজ্ঞার বস্তু। এইভাবে 'ন্যাটিভিটির' থিমটির অভিনব ব্যাখ্যায় ছবিটি মানব সভ্যতারই এক চিত্রকল্প হয়ে দাঁড়ায়। এবং একই সঙ্গে 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিটিরও। লিওনার্দোর তৈলচিত্রটির শটের সঙ্গে বাখের 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতের প্রয়োগ এখানে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আসে। সঙ্গীতটি দৃশ্যবস্তুর 'কাউন্টারপয়েন্ট' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

'কাউন্টারপয়েন্টের' ধারণাটি জন্ম নেয় পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিবর্তনের

সাথে সাথে। অবশ্য চিত্রকলা, বিশেষত প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলায়, এর ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীন মিশরীয় দ্বি-মাত্রিক চিত্রে মানুষের মুখটি থাকে প্রোফাইলে আর চোখদুটো থাকে সামনে দর্শকের দিকে। অর্থাৎ একই বিষয়কে দু'ভাবে বলা হল এবং দু'টো ভঙ্গিই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি 'কাউন্টার-পয়েন্টের' প্রয়োগে ভিন্ন মাত্রা পায়। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সঙ্গীতে কাউন্টারপয়েন্ট সৃষ্টি হয় একাধিক স্বরের সম-উপস্থিতিতে। চলচ্চিত্রে এর ব্যবহার প্রায়শই হয়ে থাকে। খ্রীস্টীয় ধর্মে 'প্যাশন' কথাটি বলতে বোঝায় ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু। অর্থাৎ মানুষের পরিত্রাণের জন্য যিশুর আত্মত্যাগ। এর বিবরণ আমরা নিউ টেস্টামেন্টের চারটি মঙ্গল-সমাচারে পাই। এই মঙ্গল-সমাচারগুলিতে যিশুর জীবনের শেষ ক'দিনের যে ঘটনা বিবৃত রয়েছে সেটি ভিত্তি করে মধ্যযুগে 'প্যাশন প্লে' অভিনীত হত। 'প্যাশন-প্লে'-তে সঙ্গীতের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। 'প্যাশন সঙ্গীতের' জন্ম রোমান ক্যাথলিক গীর্জায়। অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে যিশুর জীবনকাহিনী ও তাঁর বাণী সহজ করে বোঝানর জন্য সুর করে যীশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আখ্যান শোনান হত। পিয়ানো যন্ত্রটি আসার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। সুরের বিচিত্র ও জটিল রূপ প্রকাশের দ্বার খুলে যায়। প্যাশন সঙ্গীতেও এর প্রভাব পড়ে। বাখে এসে প্যাশন সঙ্গীতের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। বাখ যে পাঁচটি প্যাশন সঙ্গীত লিখেছিলেন তার মধ্যে দু'টি সঙ্গীত কেবল পাওয়া যায়। এই দু'টির মধ্যে 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতটি সুরের বৈচিত্র্যে ও ভাবের মাহাত্ম্যে বিশিষ্ট। এই ভাবে সোজা সরল আখ্যানটি ক্রমে এক জটিল রূপ নেয়। অর্থাৎ যেটি ছিল একান্তই লোকশিক্ষার সরল কাহিনী বাখের সঙ্গীতে সেটিই এক অনন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির ব্যঞ্জনা নিয়ে এল। যিশু উচ্চারিত প্রতিটি বাণী, তাঁর প্রতিটি কর্ম অর্থবহ হল। আমরা এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এক ইন্দ্রিয়াতীত মহাজগতের আভাস পেলাম।

লিওনার্দোর আঁকা ছবিটির সঙ্গে 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতের ব্যবহার এক মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি করে। ছবিটিতে বর্ণিত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বুদ্ধির ঔদ্ধত্য, নিপীড়িত মানুষের সংশয়—এই সবের মাঝখানে যীশু-জন্মের মহান বাণীটি মানুষের কাছে এখনও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি। যদিও তারা অনুভব করে পৃথিবীতে এক অনন্য ঘটনা ঘটে গেছে। এই অনুভূতির সমান্তরালে আমরা

আরেকটি বিপরীত অনুভূতির আভাস পাই। সেটি হল প্যাশন সঙ্গীতে সৃষ্ট যিশু-জন্মের এক ঐশী বাণী। ধ্বংস, হিংসা, সংশয় ও বুদ্ধির বাইরে এক সৃষ্টিশীল বিশ্বের উপস্থিতি আমাদের সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত করে। পরস্পরবিরোধী স্বরের এই 'পলিফনি' বস্তুত 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিটিরই মুখবন্ধ। আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে জরুরী। 'পলিফনিটি' ব্যবহৃত হয়েছে ছবিটির পাঠবস্তুর অঙ্গ হিসাবে। মূল কাহিনীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ নেই যদিও তথাকথিত কাহিনী, অর্থাৎ ঘটনার ক্রমবিকাশ, যুক্তিগ্রাহ্য চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি বলতে এখানে কিছু থাকেনা। ঘটনাগুলির সঙ্গে এটি কবিতার মতই বিষয়ীগত অনুষঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে ছবিটির মূল স্বর।

জেমস জয়েস তাঁর 'ইউলিসিস্' উপন্যাস লিখতে শুরু করেন ১৯১৪ সালে। আর এই বছরেই তৈরি হয় গ্রিফিথের 'বার্থ অব্ এ ন্যাশন' ছবি। সালটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ উপন্যাস যখন এরই মধ্যে মনোজগতের গভীরে অনায়াসে বিচরণ করছে চলচ্চিত্র তখন সবেমাত্র গল্প বলার সরল রীতিটি আয়ত্ত করতে ব্যস্ত। ১৯২৫ সালে তৈরি হয় 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন', ১৯৩৯-এ রেনোয়ার 'রুলস অফ দি গেম', ১৯৪১-এ ওয়েলসের 'সিটিজেন কেইন', ১৯৪৮-এ ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিফ', ১৯৫০-এ কুরোশোয়ার 'রশোমন', ১৯৫৫-তে 'পথের পাঁচালি', ১৯৫৬-তে বার্গম্যানের 'সেভেন্থ সীল', ১৯৫৯-এ বুনুয়েলের 'নাজারিন' ও গোদারের 'ব্রেথ্‌লেস'—এই অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র তার গল্প বলার শৈশব অবস্থা কাটিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যমে পরিণত হয়। যে কোন শিল্পমাধ্যমই ভাষার মর্যাদা পায় তার চিন্তার প্রকাশ ক্ষমতায়। এই অর্থে চলচ্চিত্র পুরোপুরিই একটি ভাষা। প্রকাশ ক্ষমতায় চলচ্চিত্র এখন আধুনিকতম উপন্যাস ও যে কোন মননশীল প্রবন্ধের সমকক্ষ, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের মতোই বাস্তবের বিমূর্ত রূপ-নির্মাণে সমান দক্ষ। ১৯৪৮ সালে চলচ্চিত্র পরিচালক আলেকজাঁদ্র আস্ত্রুক তাঁর 'কামেরা-স্তিলো' তত্ত্বে চলচ্চিত্রের এই চিন্তা-প্রকাশের বিশেষ ক্ষমতাটিকেই চলচ্চিত্রের এক এবং একমাত্র ধর্ম বলে চিহ্নিত করেন। ক্যামেরা শুধু দৃশ্যগ্রাহক যন্ত্র নয়, কলমের মতোই হবে তার স্বচ্ছন্দ গতি। কেবল দৃশ্য ও শ্রাব্যবস্তুর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে চলচ্চিত্র হবে লিখিত ভাষার মতই সূক্ষ্ম ও সাবলীল। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি, সত্যিকারের চলচ্চিত্র এই অর্থে আদৌ অডিও-ভিশুয়াল আর্ট নয়। অর্থাৎ চলচ্চিত্র-সমালোচক জ্যঁ আঁদ্রে ফিয়েশ্চি তথাকথিত যে সব চলচ্চিত্রকে 'টু কোলাম সিনেমা'—এক সারণীতে দৃশ্যবস্তু, অন্য সারণীটিতে সংলাপ, আবহসঙ্গীত, ধ্বনি

ইত্যাদি—বলে আখ্যা দিয়েছেন সেগুলি প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্র অভিধা পায়না। 'স্যাক্রিফাইস্' ছবির আলোচনায় চলচ্চিত্রের এই সংক্ষিপ্ত পটভূমি বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতা এই যে চলচ্চিত্র অডিও-ভিশুয়াল আর্ট এই ধারণাটি তারকোভস্কির ছবি এবং বিশেষ করে আলোচ্য ছবিটি নস্যাৎ করে দেয়। অবশ্য চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত বেশ কিছু রয়েছে। তবে তারকোভস্কির ধারাটি একেবারেই স্বতন্ত্র। একথা বলা বাহুল্য যে ছবিতে দৃশ্য ও শ্রাব্য দুটো উপাদানই থাকে। তবে কীভাবে থাকবে সবটাই নির্ধারিত হয় ঐ বিশেষ ছবির চিন্তার বিন্যাসের ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী। আমরা শুরুতেই আলোচনা করেছি তারকোভস্কির ছবির মূল সূত্রটি। এবার 'স্যাক্রিফাইস' ছবিটির ক্ষেত্রে এর পুনরুত্থাপন প্রয়োজন।

ছবির দ্বিতীয় শটে আমরা দেখি এক বিমূর্ত নিসর্গচিত্র। বিমূর্ত, যেহেতু বিশাল সবুজ প্রান্তর, সমুদ্র সব মিলিয়ে দৃশ্যটি পৃথিবীরই চিরন্তন রূপ, আলেকজাণ্ডারের মুখে এটি একটি দ্বীপ, এ ছাড়া কোন স্থানের সঠিক হদিশ মেলে না, আবার কালেরও নয়, কারণ ছবিটি যে ভাবে এগিয়ে আবার শেষ শটে একই দৃশ্যে ফিরে এসেছে, সত্যতার একটি অন্তহীন প্রক্রিয়াই এতে প্রকাশ পায়। আবার অন্য অর্থে দৃশ্যটি বিশেষ স্থান-কালেরও নির্দেশ দেয় এই অর্থে যে ছবিটির মুখ্য চরিত্র আলেকজাণ্ডারের আত্মিক সঙ্কটের জন্ম এই বিংশ শতাব্দীর ভোগ-বাদী সমাজের গর্ভেই। অর্থাৎ চিত্রকল্পের ব্যাপ্তি গড়ে ওঠে বাস্তবের যথাযথ পরিবেশনেই। আমরা একটি মন্দিরকে আঁকছি। একটি দিনের আবর্তনে, দৃষ্টিকোণের তফাতে এর বিচিত্ররূপ দেখা যায়। প্রতিটি রূপই আবার মন্দিরের বহিরঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলির টানে প্রকাশ পায়। অথচ মন্দিরের একটা বিমূর্ত ধারণা তৈরি হয়ে যায় যা আপাতদৃশ্য বাস্তবকে ক্রমাগত 'ধ্বংস' করে। ছবিতে দীর্ঘ সময় ধরে 'বিস্তার'-পর্বের দৃশ্যগুলি একইভাবে বিমূর্ত রূপ পায়। গোটা ব্যাপারটিই কি বাস্তবে ঘটেছে, না আলেকজাণ্ডারের স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন, আলেক-জাণ্ডারের সন্তান 'ছোট্ট মানুষটি'র স্বপ্ন না অটোর দ্বারা সংঘটিত কোন অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ—এসবের কোন ইঙ্গিতই পরিচালক আমাদের দেননি। কারণ ছবিটির বিষয়সত্বার বিকাশে এ ধরণের কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রশ্ন অর্থহীন। বিষয়টি আমরা অন্যভাবেও ভাবতে পারি। ছবিতে প্রকৃত অর্থে দু'টো ঘটনাই ঘটেছে—প্রথম দৃশ্যে পিতাপুত্র দ্বারা মৃত, নিষ্পত্র গাছে জলদান, আবার শেষ দৃশ্যেও এই একই কার্যের পুনরাবৃত্তি, অবশ্য এবার শুধু পুত্রটিই থাকে। মাঝের দৃশ্যগুলি দুটো ঘটনাকে ধরে রাখে কেবল পরিচালকের চিন্তার বিমূর্ত অভিক্ষেপ

হিসাবে, একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে। ছবিতে 'ছোট্ট মানুষটি' অপারেশানের পর তার বাক্‌শক্তি ফিরে পায়। আদিতে বাণী থাকার সেই ঐতিহাসিক সংলাপটি বলে।

এর আগেই ঘটে গেছে আলেকজাণ্ডার দ্বারা সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এবং তার মৌনব্রত পালনের প্রতিজ্ঞা। আলেকজাণ্ডারের পুত্রের মুখে উপরোক্ত সংলাপটিতেই থাকে বৃত্তটি সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়া।

ছবিটিতে ধ্বনি প্রয়োগের প্রশ্নে প্রথমেই মেষপালকের রহস্যময় ডাকটির কথা ভাবা যাক। শব্দটি আমরা ছবিতে অনেকবারই শুনি। আমরা পর্দায় সারাক্ষণ যা দেখি সেগুলির সঙ্গে শব্দটির কোন বস্তুগত যোগসূত্র খুঁজে পাই না। ছবিতে কোন সময়েই আমরা মেষপালকের দল দেখি না। আবার ছবির ঘটনাবলী যে স্থানে ঘটে সেখানে মেষপালক থাকার কোন প্রশ্ন নেই। অথচ শব্দটি ছবির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবহৃত অন্য শব্দগুলি সম্পর্কেও প্রায় একই কথা বলা যায়। 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতটি ছাড়া আরও আবহ সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে—জাপানি সাকুহাচি বাঁশি এবং অর্গানে একটি প্রেলুড পিস।

ছবিতে সংলাপের ভূমিকা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্বস্ত চরিত্রচিত্রণ এবং কাহিনীকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 'স্যাক্রিফাইস্' ছবিতে সংলাপের এ-জাতীয় কোন ব্যবহার দেখা যায় না। প্রথমে চরিত্রচিত্রণের বিষয়টি ধরা যাক।

আলেকজাণ্ডার ছিল মঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেতা। অর্থ ও খ্যাতির আবর্তে সে ক্লান্ত হয়। মঞ্চ ছেড়ে এই নির্জন দ্বীপে বসবাস করতে থাকে। ইতিহাসের প্রাক্তন শিক্ষক অটো এখন অবসর সময়ে চিঠি বিলি করে। আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী আদেলেইদ অর্থ ও খ্যাতির আকর্ষণেই আলেকজাণ্ডারকে বিয়ে করে। সংলাপে এ জাতীয় কিছু তথ্য ছাড়া আর বিশেষ কিছুই থাকে না। চরিত্র দুটি তাদের বর্তমান মানসিক অবস্থা নিয়েই আমাদের কাছে উপস্থিত। এ ব্যাপারে দস্তয়ভস্কির চরিত্রায়ণের পদ্ধতির সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। অন্যান্য বাস্তববাদী লেখকদের মতো দস্তয়ভস্কি কখনই কোন চরিত্রকে ব্যাখ্যা করেন না। চরিত্রটি ইতিমধ্যেই পূর্ণতা পেয়েছে এমন একটা অবস্থান থেকে লেখকের অন্বেষা শুরু হয়। অটোর সংলাপ তার রহস্যময়তাকেই বেশি ব্যক্ত করে। তার হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় একটি বাস্তব চরিত্রের রূপ থেকে বরং একটি অলৌকিক 'মোটিফের' সাদৃশ্যই বেশি ধরা পড়ে। যেমন, যেখানে অটো আদেলেইদ,

আলেকজাণ্ডারের ডাক্তার বন্ধু ভিক্তর ও কন্যা মার্তার কাছে একটি 'ঘটনার' কথা শোনায়। ঘটনাটি এরকম। যুদ্ধে জনৈক মার একমাত্র সন্তান মারা যায়। যুদ্ধে যাওয়ার আগে মা ও ছেলের একটি ছবি তোলা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কেটে যায়। মার কাছে পুত্রের স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে। এই সময়ে ঘটে আশ্চর্য এক ঘটনা। মৃত সন্তানের মা আবিষ্কার করে ঐ ছবিটি। ছবিটিতে যুবকটির যুদ্ধে যাওয়ার আগের চেহারাটিই আছে, কেবল মার চেহারাটিই অবিকল কুড়ি বছর আগের। অটো এখানে স্মৃতির অমোঘ প্রক্রিয়া, স্মৃতির আকস্মিক 'বিস্ফোরণের' কথাই বলছে এবং এই অর্থেই ঘটনাটি 'অলৌকিক'। রহস্যময়ী পরিচারিকা মারিয়া, কন্যা মার্তা এবং এবং পরিচারিকা জুলিয়ার বস্তুত কোন সংলাপই নেই।

আধুনিক চলচ্চিত্রে প্লট ব্যাপারটি কার্যত উঠে গেছে। একটা কাহিনী বলতে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ কাহিনীটির একটা শুরু, তার বিস্তারপর্ব এবং সমাপ্তি, সেটিও খুব প্রচলিত নয়। গোদার তো কাহিনা ব্যাপারটিকেই তাঁর ছবি থেকে বর্জন করেছেন। গোদার তাঁর ছবিকে একটা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করতে বেশি মনস্ক। তারকোভস্কিও কাহিনী বলায় উৎসাহী নন। তবে গোদার থেকে তাঁর ধারাটি ভিন্ন। গোদারের পদ্ধতি অনেকটা বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার মতো। গোদার একটা কেন্দ্রীয় চিন্তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে নানা দিক থেকে এর বিশ্লেষণ করেন, এমনকি চিন্তাটির বৈধতাকেই প্রশ্ন করেন, অর্থাৎ প্রধানত আমাদের মননকে আহ্বান জানান সমস্যাটি বুঝতে। তারকোভস্কির ছবিতে মননের ভূমিকা থাকে পশ্চাতে। তাঁর ছবির কেন্দ্রীয় চিন্তাটি মূলত বিষয়ীগত অনুষঙ্গে গড়ে ওঠে, চিন্তাটি ক্রমে বিভিন্ন স্তরের সন্নিবেশে একটা অখণ্ড রূপ নেয় যাকে কোন সরল উপপাদ্যে রূপান্তরিত করা যায় না। গঠনটি অনেকটা স্থাপত্যের মতো, কোন একটি অংশকে বাদ দিলে গোটা কাঠামোটাই ভেঙে পরে। 'স্যাক্রিফাইস' ছবিতে সংলাপ এই স্থাপত্যের একটি অঙ্গ মাত্র। 'ন্যারেটিভ'-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সংলাপের ভূমিকা ততটাই যতটা এই ন্যারেটিভটির অগ্রগতি ওই স্থাপত্যকেই গড়তে সাহায্য করে।

ছবিটিতে দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তু তাদের বস্তুগত ভিত্তি থেকে সরে গিয়ে বিষয়ীগত সম্পর্কের এক পূর্ণাঙ্গ শরীর তৈরি করে। কীভাবে এই কাণ্ডটি ঘটে? কবিতার প্রসঙ্গ এখানে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। অবশ্যই বানান করে এই গঠন-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না, কবিতার গঠনের সঙ্গে এর একে-একে-দুই এই

সম্পর্ক স্থাপনও করা যায় না।

জাপানি চিত্রাঙ্কনের একটা বিশেষ রীতি আছে। ধরুন একটি গাছ আঁকা হচ্ছে। চিত্রকরের তুলি বা কলমের টান থাকে নীচ থেকে ওপরে, অর্থাৎ যে ভাবে গাছটি বীজ থেকে জন্ম নেয় এবং কাণ্ড বেয়ে ক্রমে শাখাপ্রশাখা, পত্রপুষ্প নিয়ে আকাশে প্রসারিত হয়। 'স্যাক্রিফাইস' ছবিটির ক্ষেত্রেও এমন একটা পদ্ধতি দেখা যায়। প্রথম শটের শেষভাগে ক্যামেরা লিওনার্দোর ছবির গাছটিকে ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যায়। শেষ শটেও ক্যামেরার অনুরূপ মুভ্‌মেণ্ট দেখা যায়, তবে মুভ্‌মেণ্টটি এবার মৃত, নিষ্পত্র গাছটিকে ধরে ঘটে। গাছটির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রথম শটে যে সঙ্গীত ব্যবহৃত হয় সেটা শেষ শটেও আমরা শুনতে পাই। প্রথম শটে সঙ্গীতটি ছবির মূল সুরেরই পূর্বঘোষণা করে এবং শেষ শটে সুরটি পরিপূর্ণ রূপ পায়। এভাবে দুটো শটের মধ্যে বিষয়ীগত ঐক্য তৈরি হয়। বিশদে বলতে গেলে, সমস্যাটি এই পৃথিবীর, সমাধান পায় সৃষ্টির পথ ধরে যেমন করে গাছটি বেড়ে ওঠে, বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে গাছটির একটা জৈবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্যভাবেও বিষয়টি ভাবা যায়। শেষ শটে সঙ্গীত ক্যামেরা মুভ্‌মেণ্টের পুনরাবৃত্তি একটা ধুয়া (রিফ্রেইন) হিসাবে কাজ করে। এই রকম ধুয়ার ব্যবহার কবিতায় প্রায়শই হয়ে থাকে। এ ধরনের ধুয়ার ব্যবহারে আমরা প্রাথমিক অনুভূতিতে ফিরে যেতে পারি। ফলে ঐ অনুভূতিটি গভীরতর ব্যঞ্জনা পায়।

প্রথম শটের শেষ-অংশে আমরা সঙ্গীতের সঙ্গে সমুদ্র শকুনের ডাক, ফগহর্ণের শব্দ ও সমুদ্রের অস্ফুট গর্জন শুনতে পাই এবং অব্যবহিত পরেই শটের পরিবর্তন হয়। আমাদের সামনে এক বিশাল নিসর্গ-দৃশ্য উন্মোচিত হয়। উপরোক্ত শব্দগুলি দৃশ্যটির পটভূমি তৈরি করে।

পটভূমিটি এইরকম—যেন আদি ও অনন্ত পৃথিবীতে একটি চিরন্তন নাটক ঘটতে চলেছে। শুধু মঞ্চটিই নেই, গোটা পৃথিবীই এখানে একটি মঞ্চ যেন। তিনটি মূল চরিত্র আলেকজাণ্ডার, অটো ও আলেকজাণ্ডারের পুত্রকে এই নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা হয়। লক্ষণীয়, এই দিনটি আলেকজাণ্ডারের জন্মদিন। মৃত, নিষ্পত্র গাছে জল দিতে দিতে আলেকজাণ্ডার তার ছেলেকে একটি উপাখ্যান শোনায়। প্রাচীনকালে কোন এক মঠের নবীন সন্ন্যাসী তার তার গুরুর আদেশে রোজ পাহাড় বেয়ে উঠত এবং পাহাড়ের চূড়ায় একটি মৃত গাছে জল দিত।

দীর্ঘ তিন বৎসর পর গাছটি পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হয়। এই উপাখ্যানে ছবির

একটি মূল 'মোটিফ' নিহিত থাকে। 'মোটিফ'-টি হল মিলনের—মৃত গাছে প্রাণ-সঞ্চারের এই প্রলম্বিত, নিরলস সাধনায় আমাদের সমগ্র সত্তাটিই জড়িয়ে থাকে এবং এই ভাবে আমরা বিশ্বের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটি জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন করি। 'মোটিফ'-টির পুরো ব্যঞ্জনা অবশ্য এখানে থাকে না।

ছবির প্রতিটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ বাস্তবের যথাযথ চিত্ররূপ, প্রতিটি দৃশ্যই তোলা হয় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। এখানে আলাদা করে কোন অর্থ থাকে না, কোন প্রতীকের ব্যবহারও হয় না। তারকোভস্কির চিন্তায় প্রতীকের ব্যবহার বস্তুত শিল্প-সৃষ্টির পরিপন্থী। অর্থ তৈরি হয় দৃশ্যের পরম্পরায়। একটি দৃশ্য অর্থবহ হয়ে ওঠে দৃশ্যটির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দৃশ্যগুলির সন্নিধি (Juxtaposition)-তে। দৃশ্যগুলি ক্রমাগত এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসার প্রক্রিয়াতেই একটি বিশেষ দৃশ্যে বিভিন্ন স্তর বিন্যস্ত হয়। আমরা ছবির দৃশ্যগুলির একটি বিমূর্ত রূপের কথা আগেই বলেছি। এই বিমূর্ত রূপ সৃষ্টি হয় উপরোক্ত ওই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই। একটি দৃশ্যের কথা ভাবা যাক যেখানে উচ্ছিষ্ট বস্তু ও জল-কাদার ওপর দিয়ে ক্যামেরা 'মুভ' করে। জল-কাদার ওপর কিছু মুদ্রা ছড়ানো-ছিটানো থাকে। তারকোভস্কিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কেন ওই মুদ্রাগুলি ছড়িয়ে রেখেছেন। উত্তরে তারকোভস্কি বলেন, আমি ঠিক জানিনা, কী করে জানব! 'নগ্ন নির্জন হাত' কথাটির মতোই এরও কোন আক্ষরিক অর্থ হয় না, যেহেতু গোটা ছবিটি একটি জৈবিক শরীর-বিশেষ এবং উপরোক্ত দৃশ্যটি এই শরীর জড়িয়েই থাকে। তিনি আলাদা করে মুদ্রা নিয়ে ভাবেননি, মুদ্রা এসে গেছে।

পরবর্তী তিনটি শটে আমরা আলেকজাণ্ডারের আত্মিক সঙ্কটের স্বরূপটি জানতে পারি। তার সঙ্কটটি সভ্যতারই সংকট। একদিকে যন্ত্রসভ্যতার অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা, অন্যদিকে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয়, ফলে মানুষ খণ্ডিত, নিরালম্ব। আলেকজাণ্ডার এই অসহ নির্জনতা সহ্য করতে পারে না, অনর্গল স্বগতোক্তিতে মুক্তি খোঁজে। এর পরেই দেখি আলেকজাণ্ডারের জ্ঞান হারানোর দৃশ্য এবং অব্যবহিত পরের সাদা-কালো শটে একটি বিধ্বস্ত রাস্তা, আতঙ্কিত, বিভ্রান্ত মানুষ ছোটাছুটি করে, যেন দুঃস্বপ্নের এক প্রতিচ্ছবি। মেষপালকের রহস্যময় ডাকটি ভেসে আসে। ধ্বনিটি আমরা এর আগে একবার শুনতে পাই যখন আলেকজাণ্ডার তার পুত্রকে প্রাচীন উপাখ্যানটি শোনায়। এছাড়া আরও ছ'টি দৃশ্যে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। দৃশ্যগুলি হল—'অলৌকিক ঘটনা'-টি শোনানোর পর অটো এক অদৃশ্য আঘাতে মেঝেতে পড়ে যায়; আলেকজাণ্ডার ঈশ্বরের কাছে শপথ করে, সে তার স্ত্রী-পুত্রকন্যা,

পার্থিব সম্পদ সবই ত্যাগ করবে যদি তিনি পৃথিবীকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন ; অটো মারিয়ার কাছে যাওয়ার জন্য আলেকজাণ্ডারকে কার্যত বাধ্য করে, কারণ সে জানে মারিয়ার সঙ্গে মিলনে আলেকজাণ্ডারের পরিত্রাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতিরও ; মারিয়ার বাড়িতে যাওয়ার পথে আলেকজাণ্ডার সংশয়ান্বিত হয় ; আলেকজাণ্ডার মারিয়ার বাড়িতে নিজের কপালে পিস্তল ঠেকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বোমারু বিমানের গর্জনে সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে ওঠে এবং আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মারিয়ার মিলনের অলৌকিক দৃশ্যটির পর ক্যামেরা বিধ্বস্ত রাস্তার দৃশ্য থেকে পেছনে ফিরে কাচের স্তম্ভে প্রতিফলিত অট্টালিকার দৃশ্য ধরে, ক্যামেরা আরও পিছিয়ে গেলে আমরা আলেকজাণ্ডারের নিদ্রিত পুত্রকে দেখি। পর্দায় এরপর দ্রুত কিছু দৃশ্য ফুটে ওঠে, যেমন, আদেলেইদ ঘাসের উপর ঘুমন্ত আলেকজাণ্ডারের পাশে বসে আছে, লিওনার্দোর ছবিটি এবং নগ্ন মার্তা বাড়ির বারান্দা থেকে মুরগির দল তাড়ায়। শব্দটি শুধু দৃশ্যগুলির 'কাউন্টার পয়েন্ট' হিসাবেই ব্যবহৃত হয়নি, প্রতিবারই শব্দটি এই শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত আগের ও পরের দৃশ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি 'অলৌকিক' ব্যঞ্জনা আনে। 'অলৌকিক' এই অর্থে যে এই শব্দের সঙ্গে যুক্ত প্রথম দৃশ্যে আলেকজাণ্ডার বর্ণিত প্রাচীন উপাখ্যানটিতে যে সাধনার কথা থাকে তার পরিণতি ঘটে একমাত্র একটি শাশ্বত জৈবিক সম্পর্ক স্থাপনেই, মননের পথে কখনই নয়। মেষপালকের ডাকের পরিপ্রেক্ষিতে বাইবেলের একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যিশুর জন্মের বার্তা মেষপালকরাই প্রথম দেবদূতের মাধ্যমে জানত পারে। অর্থাৎ মেষপালকের ডাকের মধ্যে দিয়ে যেন ঈশ্বরের কণ্ঠই আমরা শুনি। ঈশ্বর অর্থে আমরা এখানে একটি চিরন্তন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কথাই বুঝি। যদিও আমরা জানি তারকোভস্কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

ছবিতে ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির বিন্যাস একটি বিষয়ীগত কার্যসিদ্ধি করে। তারকোভস্কি মনে করতেন, আমাদের এই দৃশ্যমান জগত এমনিতেই এত ধ্বনিময় যে ছবির জন্য আলাদা করে সঙ্গীত রচনা না করলেও চলে। কিন্তু এই শব্দগুলি তো আসলে বোধের জগতেরই যেখানে সময়ের কোন পরম্পরা নেই, নেই বাস্তব আর স্বপ্নের ভেদরেখা। এই সূত্রের ভিত্তিতেই 'স্যাক্রিফাইস' ছবির শব্দগুলি সংগঠিত হয়েছে।

এইভাবে ছবিটি দৃশ্যের পর দৃশ্যকে গেঁথে নিয়ে বিলম্বিত লয়ে চলে। আলেকজাণ্ডারের জন্মদিনে অটো তাকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের একটি মানচিত্র উপহার দেয়। আলেকজাণ্ডার মানচিত্রটি দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্তু এটি

তো ইয়োরোপের ভূগোলের সঠিক চিত্র দেয়না, সে বলে। কথাটি স্বীকার করে নিয়ে অটো বলে, কিন্তু মানুষ তো তখনও বাঁচত এবং খুব একটা খারাপভাবে নয় নিশ্চয়। অর্থাৎ জ্ঞানের মানচিত্রে জীবনের পুরোপুরি প্রতিফলন কোনদিনই ঘটে না। এর পরেই আসে অটো কর্তৃক 'অলৌকিক' ঘটনাটির বিবরণ এবং বজ্রপাত ও বোমারু বিমানের পৃথিবী কাঁপানো শব্দ ও মেষপালকের ডাক।

আলোচনার এই পর্বে ছবিটির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা পদ্ধতির কথা বলা জরুরি হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইনের 'মন্তাজ' পদ্ধতি এবং চলচিত্র সমালোচক আঁদ্রে বাজ্যাঁর 'সিকোয়েন্স শট' ও 'ডিপ ফোকাস' ব্যবহারের দর্শনটির কথা বলতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাজ্যাঁ মনে করতেন 'মন্তাজ' রীতিটি বস্তুত মননের কসরত এবং এর দ্বারা বাস্তবের বিচিত্র ও দ্ব্যর্থবোধক রূপের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে না। 'মন্তাজ'-এর লক্ষ্য মূলত বাস্তবের একটি মননজাত নক্‌শা গঠন, 'সিকোয়েন্স শট' এবং 'ডিপ ফোকাস্'-এর প্রয়োগে একটি দৃশ্যের স্থান-কাল এবং নাটকের ঐক্য বজায় থাকে, উপরন্তু বাস্তবকে তার স্ব-রূপে ধরা যায়। এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আমরা এই তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি চলচ্চিত্র ভাষার ক্ষেত্রে এই দুটি পদ্ধতিই অপরিহার্য এবং এই কথাটি আধুনিক অনেক পরিচালকের ছবিতে প্রমাণিত হয়েছে। তারকোভস্কি আইজেনস্টাইনের 'মন্তাজ' পদ্ধতির বিরোধী। এই পছন্দ, অপছন্দের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিল্পী আসলে কী করতে চাইছেন, তাঁর দর্শনটাই বা কী এ সবের উপর। 'স্যাক্রিফাইস' ছবিতে তারকোভস্কি যে জগত সৃষ্টি করতে মগ্ন সেই সৃষ্টিকর্মে মননের থেকে স্বজ্ঞা ও অনুভূতির ভূমিকা অনেক বেশি। ফলত শিল্পী তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন এবং আমাদের আহ্বান জানান এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় নিজের মতো করে যুক্ত হতে। ছবিতে ঘটনাগুলি কেন ও কী ভাবে ঘটে এই সবের কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য সূত্র পরিচালক আমাদের দেন না।

অর্থাৎ পরিচালক তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেন না। আবার প্রচলিত ছবির যেগুলি প্রধান উপাদান, যেমন, মেলোড্রামা, ঘটনার চমক, নাটকীয় সংঘাত, সেগুলিও তিনি সযত্নে এড়িয়ে যান। ফলত এই ছবিতে সম্পাদনার ভূমিকা হল দৃশ্যগুলিকে পরপর সাজিয়ে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ চিত্র নির্মাণ করা, যেমন করে একটি কবিতা বা একটি স্থাপত্য নির্মিত হয়। অবশ্যই চিত্রগ্রহণের রীতি এই নির্মাণকার্যের পূর্ববর্তী ভূমিকাটি পালন করে। ছবিতে

'সিকোয়েন্স শট' ও 'লং টেক'-এর ব্যবহারই বেশি হয়েছে।

এই জাতীয় শটগুলি কার্যত একটি দৃশ্যের প্রকৃত স্থান-কালের ধারণাটি অটুট রাখে। 'মন্তাজ' ওই দৃশ্যটিকেই টুকরো-টুকরো করে ভেঙে ফেলে স্থান-কালের একটি বিমূর্তরূপ তৈরি করে। 'স্যাক্রিফাইস' ছবিতে চিত্রকল্পের বিমূর্তরূপ আসে বাস্তবকে যথাযথ সম্মান জানিয়েই। ফলে ছবিতে কালরাত্রির দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ সিকোয়েন্সটি আসে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। সিকোয়েন্সটি স্বপ্ন না বাস্তব, দুঃস্বপ্ন নাকি অলৌকিক কোন কার্যকলাপ এইসবের ব্যাখ্যা তারকোভস্কি দর্শকের কাছে রাখেন না।

পৃথিবীর সব রঙ মুছে যায়। গোধূলির আলোয় অপসৃয়মান মারিয়ার দিকে আলেকজাণ্ডার চেয়ে থাকে। সেই মুহূর্তে ফগহর্নের দূরাগত শব্দ ভেসে আসে, উন্মোচিত হয় নাটকের আরেকটি অঙ্ক যে নাটকটির আরম্ভ ছবির প্রথম দৃশ্যে। এর আগে যা-যা ঘটে সেগুলি প্রস্তুতিপর্বমাত্র। এই সিকোয়েন্সের একটি জায়গায় আলেকজাণ্ডার বলছে, অভিনেতার কাজ নয় তার অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়া, চরিত্রটিকে 'ব্যাখ্যা' করাতেই তার ভূমিকাটি যথাযথ পালিত হয় এবং এইভাবেই চরিত্রটি অনেক বেশি বাস্তবানুগ হয়, নাটকের বিষয়বস্তুও গভীরতর ব্যঞ্জনা পায়। আলেকজাণ্ডার তো অভিনেতা। সে একসময় 'রিচার্ড দি থার্ড'-এ রিচার্ড ও 'ইডিয়ট'-এ প্রিন্স মিশ্‌কিনের চরিত্রটি অভিনয় করত। আর এই ছবিতে সে 'আলেকজাণ্ডার'-এর চরিত্রটিকেই যেন 'ব্যাখ্যা' করবে। একদিক থেকে ছবিটির কেন্দ্রীয় সমস্যাটিকে আমরা আলেকজাণ্ডারের চিন্তার অভিক্ষেপ হিসাবেই ভাবতে পারি। এই 'ব্যাখ্যা'-র প্রক্রিয়ায় তো আমরা সমস্যাটির সঙ্গেই অনেক বেশি সংলগ্ন হই।

পৃথিবীর সব রঙ মুছে যায় (দীর্ঘ সিকোয়েন্সটির পুরোটাই 'মনোক্রোমে' ধরা হয়েছে)। লিওনার্দোর 'অ্যাডোরেশন্ অফ দি মেজাই' ছবিটি অটোকে ভীত করে। নেমে আসে কালরাত্রি। শুরু হয় চরিত্রগুলির আত্ম-দর্শনের এক দীর্ঘ-প্রলম্বিত যন্ত্রণার পালা যা বস্তুত অবচেতন মনেরই অনিবার্য এক 'বিস্ফোরণ'। আলেকজাণ্ডার তো অনেক আগে থেকেই জানে এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে—ভোগবাদী সমাজ তার গর্ভেই জন্ম দেয় পৃথিবীর অন্তিম বিনাশের অবশ্যম্ভাবিতাকে। জাপানি সাকুহাচি বাঁশির সুরে এই অন্তিম ধ্বংসের শোকবার্তা ঘোষিত হয়।

সাকুহাচি বাঁশির সুরটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে প্রথাগতভাবেই, দৃশ্যের ভাবটিকে গভীরতর অনুরণন দিতে। এই বাঁশিটি পরিপূর্ণ রূপ পায় সপ্তদশ শতাব্দীর

শেষে 'কমুসো' নামক ভ্রাম্যমান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাতে। এই সন্ন্যাসীদের দলে বুদ্ধের ভক্তদের চাইতে 'রোনিন্', অর্থাৎ প্রভুহীন 'সামুরাই'-দের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। জাপানে তখন ঘোর দুঃসময়। সামন্তরাজাদের মধ্যে অন্তহীন সঙ্ঘর্ষে সমাজ ভেঙে পড়েছিল। প্রভু সামুরাইরা প্রতিহিংসায় মত্ত হয়ে ওঠে। সাকুহাচি বাঁশিবাদকের আড়ালে তারা বুদ্ধের উপাসনা থেকে তাদের প্রতিহিংসা ব্যক্ত করতেই বেশি ব্যস্ত থাকত। পটভূমিটি বর্ণনা করার প্রাসঙ্গিকতা এই যে, বাঁশির স্বরটি এখানে ওই দুঃসময়েরই অনুষঙ্গ নিয়ে আসে। সেই হানাহানি, ধ্বংস ও রক্তের অপচয়।

টেলিভিশনে বিশ্বযুদ্ধের সংবাদ ঘোষণার সঙ্গে আমরা সাকুহাচি বাঁশির বিলাপ শুনতে পাই। পৃথিবী এক সর্বগ্রাসী আণবিক ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। এই দুঃসংবাদ শেষ হওয়ার আগেই দ্বীপটি বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। আলেকজাণ্ডারের বাড়ি অন্ধকারে ডুবে যায়। এইভাবে ঘটনার যথাযথ এবং বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনায় আমরা বস্তুত এক 'অবিশ্বাস্য' জগতেই প্রবেশ করি এবং প্রক্রিয়াটি ঘটে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। এই 'অবিশ্বাস্য জগত' আসলে আমাদের অবচেতন মনেরই জগত, বাস্তবের সঙ্গে এর সীমারেখা অতি ক্ষীণ। এই দীর্ঘ কালরাত্রি, আসন্ন ধ্বংসের এই শ্বাসরোধকারী প্রতীক্ষা সীমারেখাটিকে মুছে দেয়। এখন সব কিছুই ঘটতে পারে, সব কিছুই ঘটে কবিতার 'অযৌক্তিক' প্রক্রিয়ায়। ভিক্তর যন্ত্রণাবিদ্ধ আদেলেইদকে ইনজেক্শন্ দেয়। আদেলেইদের আর্তচিৎকারই প্রথম ওই শ্বাসরোধকারী নৈঃশব্দকে বিদীর্ণ করে। সে এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। ভিক্তরের ইনজেক্শন্ যেন জাদু-ঔষধ এর কাজ করে। কারণ এখন কোন কিছুই আর অসম্ভব নয়, সবকিছুই এখন ঘটতে পারে। আদেলেইদের আত্ম-জিজ্ঞাসা শুরু হয়। অর্থ আর প্রতিষ্ঠার মোহে সে তার প্রেমিককে ত্যাগ করে আলেকজাণ্ডারকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু অবচেতন মনে স্মৃতি তার অমোঘ প্রক্রিয়াটি সক্রিয় রাখে। এখন এই অগ্ন্যুৎপাত। অনুতাপদগ্ধ আদেলেইদ জিজ্ঞাসা করে, কেন মানুষ তার প্রকৃত সত্তা নিয়ে আরেকটি মানুষের কাছে যেতে পারে না, কেন তার এই খণ্ডিত অস্তিত্ব। ভিক্তর মার্তাকেও ইনজেক্শন্ দেয়। মার্তা নগ্ন হয়, যেন বাহ্য সব বস্তুকে ছেড়ে সে তার শরীরের আদি শুদ্ধতায়, প্রকৃত সত্তায় নিজেকে সমর্পণ করে।

আলেকজাণ্ডার জানত, তার জিজ্ঞাসাতেই ছিল এই অন্তিম বিনাশের বীজ। এই যুদ্ধ অন্তিম যুদ্ধ। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা সবকিছুই ধ্বংস হবে এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবে। পৃথিবীতে প্রাণের আর কোন চিহ্নই থাকবে না।

আলেকজাণ্ডার দুঃসহ যন্ত্রণায় বিদীর্ণ। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর যেন এই সমূহ বিনাশ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পার্থিব সম্পদ সব কিছুই সে পরিত্যাগ করবে যদি ঈশ্বর তার প্রার্থনায় সাড়া দেন। অটো তাকে মারিয়ার কাছে যেতে বলে। মারিয়া 'অলৌকিক' ক্ষমতাসম্পন্না এক নারী। এই নারীর সঙ্গে মিলনেই আলেকজাণ্ডারের প্রার্থনা সফল হতে পারে। মারিয়াই এখন মুক্তির একমাত্র উপায়, তার এবং মানুষেরও।

সংশয় নিয়ে আলেকজাণ্ডার মারিয়ার বাড়ির দিকে যাত্রা করে। দীর্ঘ এই পথ-পরিক্রমা। মারিয়া থাকে দ্বীপের এক প্রান্তে একটি গির্জায়। মারিয়ার বাড়ির সামনে ভেড়ার পাল ঘুরে বেড়ায়। খ্রিস্টীয় ধর্মে ভেড়ার সঙ্গে একটি পবিত্র, নিষ্পাপ ভাবের সম্পর্ক আছে। আলেকজাণ্ডার যেন একটি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে। মারিয়ার ঘরটি নিরাভরণ, সর্বত্র একটি শুচিতার ভাব বিরাজমান। মারিয়া তাকে হাত-পা ধোয়ার জল দেয়। এইসব কিছুর মধ্যেই শুদ্ধিকরণের একটি দ্যোতনা থাকে। আলেকজাণ্ডারের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি সবে শুরু হয়। আলেকজাণ্ডার অর্গানে একটি 'প্রেলুড পিস' বাজায়। সঙ্গীতটি যেন তার প্রকৃত সত্তা প্রকাশের প্রস্তুতি সূচিত করে। সে মারিয়ার কাছে স্বীকারোক্তি করে। কারণ একমাত্র এই পবিত্রতার প্রতিমূর্তির কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায়। মাকে খুশি করার জন্য আলেকজাণ্ডার তার মার বাড়ির সামনে অযত্নে পালিত বাগানের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে। বাগানের পরিবর্তিত রূপ দেখে আলেকজাণ্ডার আতঙ্কিত হয়—কোথায় গেল বাগানের সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য! এই বাগানের উপাখ্যানটি যেন আলেকজাণ্ডারের জীবনের প্রতিরূপ। অর্থ ও খ্যাতির মোহে সে তার স্বাভাবিক মানবধর্মকে ভুলে গিয়েছিল। একটি কৃত্রিম জীবনের নিগড়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। আলেকজাণ্ডারের আত্মিক সঙ্কট এরই অনিবার্য পরিণতি। সে এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে চায়, মারিয়াকে বলে তাকে গ্রহণ করতে। মারিয়া দ্বিধাগ্রস্ত হয়। আলেকজাণ্ডার তার মানসিক দ্বন্দ্বের এই অন্তহীন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। সেই মুহূর্তে বোমারু বিমানের গর্জনে সারা পৃথিবী কেঁপে ওঠে। মেষপালকের ডাক ভেসে আসে। পরমুহূর্তে ঘটে মারিয়ার সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের মিলনের এক 'অলৌকিক' ঘটনা। 'অলৌকিক' যেহেতু দৃশ্যটি বস্তুত পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনেরই দ্যোতনা আনে। প্রকৃতি এখানে মঙ্গলময়ী নারী। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদীয় ভাবনার সঙ্গে এই গূঢ়ার্থটির আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদে বর্ণিত প্রকৃতির

সংহার-মূর্তিটি কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি। এই মিলনে সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়, জগত তার ভারসাম্য ফিরে পায়। 'অলৌকিক' এই অর্থেও—শিল্প-সৃষ্টির পরিণতি একমাত্র এই 'অলৌকিকতা'-কে ছুঁয়েই, বাস্তবের এক 'অবিশ্বাস্য' অতিক্রমণেই।

পৃথিবীর সব রঙ ফিরে আসে। আলেকজাণ্ডার ঘুম থেকে জেগে ওঠে। সে বুঝতে পারে না যা-যা ঘটেছে সেগুলি স্বপ্ন না বাস্তব। স কুহাচি বাঁশির সুরটি আবার শোনা যায়। বাঁশির সুরটি বিস্মরণের গর্ভ থেকে তুলে আনে ওই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। দুঃস্বপ্নের রাতটি স্বপ্ন না বাস্তব এই প্রকারের প্রশ্ন এখানে অবান্তর, কারণ স্মৃতি তো ভবিষ্যতেরও, অন্য অর্থে সময় সীমার মধ্যে আলেকজাণ্ডারের আত্মিক সংকটেরই অভিক্ষেপ। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তার সঙ্কল্পে অটুট থাকে। সে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত হয়।

জল, মাটি, বায়ু ও আগুন এই চারটি মূল উপাদান নিয়ে হিরাক্লিতাসের পৃথিবী। এক প্রলয়ঙ্কর আগুনে (কসমিক ফায়ার) এই পৃথিবী বারবার ধ্বংস হয়, প্রথম থেকে পুনরায় শুরু হয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এই অন্তহীন প্রক্রিয়ায় পৃথিবী আবর্তন করে চলে। আলেকজাণ্ডার নিজের বাড়িতে অগ্নি-সংযোগ করে। দীর্ঘস্থায়ী হয় এই দৃশ্যটি। সশব্দে বাড়ির কাঠামো ভেঙে পড়ে, কাচ ভাঙার শব্দ হয়, অগ্নি-বিধ্বস্ত বাড়ি থেকে টেলিফোন বাজার আওয়াজ আসে, পিয়ানোর তারগুলি অদ্ভুত শব্দ করে ছিঁড়ে যায়—যেন হিরাক্লিতাসের ওই প্রলয়ঙ্কর আগুনেরই পুনরাবৃত্তি। এই বিধ্বংসী আগুনে সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, শুরু হয় এক নতুন জীবনের অন্বেষণ, আলেকজাণ্ডারের পরম শুদ্ধিকরণ, তার নবজন্মের সূচনা। এই ভাবে সম্পূর্ণ হয় একটি বৃত্ত।

আদেলেইদ, ভিক্তর, মার্তা, জুলিয়া ছুটে আসে। আলেকজাণ্ডারকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়। আলেকজাণ্ডার মৌনব্রত নেয়, কারণ সে জানে, তার আত্মিক সঙ্কট এদের কাছে পাগলের প্রলাপ মাত্র, এই বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে তার আত্মোৎসর্গ অর্থহীন। এই প্রসঙ্গে যিশুর আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। যদিও এই ধরণের তুলনা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক, তবু এই দুয়ের মধ্যে একটি ভাবগত যোগসূত্র দেখা যায়। যিশু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যখন মৃত্যুবরণ করেন কতিপয় ভক্ত ছাড়া কেউ তাঁর এই মহান মৃত্যুবরণের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি বরং বিদ্রূপ ও অপমানে তাঁকে জর্জরিত করেছিল। 'যিশুকে তিনি (প্রদেশপালক পন্তিয়াস পিলাত) কশাঘাত করলেন। তারপর তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য সৈন্যদের হাতে তুলে দিলেন।

…তাঁর গায়ে থুতু দিতে লাগল তারা (সৈন্যরা)। সেই নল ডাঁটাটা কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল। …যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাঁকে যা-তা বলে অপমান করতে লাগল…যে দুজন দস্যুকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তাঁরাও সেই একইভাবে তাঁকে নোংরা ভাষায় টিটকিরি দিচ্ছিল' (সাধু মথির মঙ্গল-সমাচার)। মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনা টি বারবার ঘটে। যাঁরাই মানুষের মুক্তির জন্য নিজের শরীরে সমস্ত পৃথিবীর গ্লানি, পাপ ও যন্ত্রণা তুলে নেন, তাঁরাই হন মূঢ়, আত্মবিস্মৃত জনতার উপহাসের পাত্র। কিন্তু তাঁদের এই আত্মত্যাগেই পৃথিবী বার বার নতুন করে উজ্জীবিত হয়। যিশুর আত্মত্যাগ এই আদি, ও অকৃত্রিম মানব প্রেমেরই এক মহান চিত্রকল্প। তারকোভস্কি চিত্রকল্পের এই ব্যঞ্জনাটিকেই এখানে রূপ দিতে চেয়েছেন। যিশুও তো রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন। তিনিও শেষপর্যন্ত যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেন না, 'আমার ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ ?' এই আর্তি যিশুর আত্মত্যাগে একটি অনন্য মানবিক মহিমা অর্পণ করে। যিশুর 'ঈশ্বরত্ব' তাঁর মানব প্রেমেরই পরম অভিব্যক্তি। আত্মোৎসর্গ তো আসলে ভালবাসারই চরম প্রকাশ। এইভাবেই আলেকজাণ্ডারের আত্মাহুতি ওই চিরন্তন চিত্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়।

শেষ দৃশ্যে আমরা প্রথম দৃশ্যের জায়গাতেই ফিরে আসি, একই কার্যের পুনরাবৃত্তি হয়, তবে এখন শুধু আলেকজাণ্ডারের পুত্রটিই থাকে। মৃত গাছে জল দেওয়ার পর সে গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আদিতে ছিলেন বাণী, কেন বাবা ?' প্রশ্নচিহ্ন ছাড়া এই কথাটি আমরা সাধু যোহনের মঙ্গল-সমাচারে পাই। এখানে আমরা মঙ্গল-সমাচারের অনুবাদক সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা শুনব। 'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্ব পাওয়ার আগেও বাণী ছিলেন। …বাণী…শব্দটির…দার্শনিক অর্থ ঈশ্বরের সেই পরম বুদ্ধি-শক্তি, বিশ্ব-জগতের সব কিছুই যা নিয়ন্ত্রিত করে রাখে'। অর্থাৎ বাণী বস্তুত ওই পরম শক্তির প্রকাশ। আবার 'বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে' (সাধু যোহনের মঙ্গল-সমাচার)। অর্থাৎ 'এই 'সঙ্গে' কথাটির মধ্যে পিতা ও পুত্রের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং জীবনগত মিলন সূচিত হয়েছে' (সজল বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'বাণী ছিলেন ঈশ্বর' (সাধু যোহনের মঙ্গল সমাচার)। অর্থাৎ 'সেই জীবনগত মিলন আসলে রূপগত ঐক্য।' …একটু পরে যোহন স্পষ্টই বলবেন, বাণী বলতে স্বয়ং ঈশ্বরপুত্রকেই বোঝায়' (স. ব.)। অর্থাৎ, যে যিশু, একাধারে রক্তমাংসের মানুষ এবং ঈশ্বরও, তিনি আবার ঈশ্বরপুত্রও। তিনি

তাঁর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াটিকেই ক্রিয়াশীল রাখেন। আলেকজাণ্ডার ও তার পুত্রের সম্পর্ক বস্তুত ওই চিরন্তন জৈবিক সম্পর্কেরই অভিব্যক্তি। পিতার জীবন পুত্রে অর্পিত হয় এবং এই ভাবে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। আবার পুত্রের ওই জিজ্ঞাসাতেই আরেকটি বৃত্তের আবর্তন শুরু। এই জিজ্ঞাসার উত্তর থাকে জলদানে। অর্থাৎ একটি সৃষ্টিকার্যের মধ্যে। কারণ সৃষ্টিই একমাত্র সত্য। ক্যামেরা গাছটি ধরে ওপরে উঠে যায়। 'সাধু মথির প্যাশন' সঙ্গীতটি পুনরায় বেজে ওঠে। এইভাবে সূচিত হয় মানুষের অন্তহীন যাত্রা। এবং শিল্পেরও। ⊏

সংযোজন

সভ্য জগতের কোলাহল, ব্যস্ততা মুক্ত এক শান্ত, নীল সমুদ্রপারের সবুজ প্রকৃতিময় জগতে থাকে প্রফেসর, অভিনেতা, নন্দনতত্ত্বের সমালোচক এই প্রৌঢ় বুদ্ধিজীবী তার স্ত্রী, কন্যা, শিশুপুত্র ও বন্ধুসহ বাস করে এক স্বপ্নের প্রাসাদে। শুরুতে দেখি শিশুপুত্র গোসেনকে নিয়ে দীর্ঘ নিষ্পত্র এক ইকেবানাগাছের কাণ্ড পোঁতে সে। এই আশায়, ভবিষ্যতে তা পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হবে। বাকরুদ্ধ গোসেনকে ঘিরে তাঁর কত আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাকে এক উপকথাও শোনায় সে : এক সন্ন্যাসী মৃতপ্রায় একটি গাছকে প্রতিদিন একই সময়ে একই ভাবে জল দিয়ে ফুলে ফলে উজ্জীবিত করেছিল। তারপরই আলেকজাণ্ডার বলে, সবাই যদি এরকম করত তাহলে পৃথিবীটাকে পালটাতে পারত, কিন্তু তা সম্ভব নয় (?) এই সময় দূর মাঠের মধ্যে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে অটো আসে। আলেকজাণ্ডারের বন্ধু অটো জন্মদিনে শহরের বন্ধুদের পাঠানো অভিনন্দন-বার্তা শুনিয়ে যায়। সারা বাড়িতে আলেকজাণ্ডার একা ঘুরে বেড়ায়। তার মনের ভিতর ভয়, বিষাদ আর একাকীত্ব। কারণ সে বলে, সভ্যতার সঙ্কট আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব বিকাশের অসামঞ্জস্যতা। বিজ্ঞানের উন্নতি এবং অবদানের পিছনে ছিল মানুষের আত্মত্যাগ, কিন্তু বিজ্ঞানকে বারবার অশুভ, অমঙ্গলজনক কাজে ব্যবহার করার পরিণতি বিশ্বযুদ্ধ এবং মানব সভ্যতার ধ্বংস। সভ্যতার আসন্ন ধ্বংসলীলা সে অনেক আগেই টের পেয়েছে। তাই সে ভীত, সন্ত্রস্ত। বিষাদগ্রস্ত মন, ভয়ার্ত অনুভূতি তাঁকে নিঃসঙ্গ করেছে। এই সঙ্কটকে সে বয়ে বেড়ায় একা। সমগ্র পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন আলেকজাণ্ডার, ক্রমশ তাঁর বিষণ্ণ অস্থিরতা, সঙ্গহীন

জটিলতা উন্মোচিত হতে থাকে। সে খুঁজে বেড়ায় সরল, মুক্ত ও বলিষ্ঠমানব-মানবী, যাঁরা এখনও যন্ত্র সভ্যতার কৃত্রিমতায় সংক্রামিত নয়। সে ফিরে যেতে চায় তাঁদের কাছে। 'রিচার্ড দ্য থার্ড' বা 'ইডিয়ট'-এর অভিনয় সে ছেড়ে দিয়েছে কারণ; সে ক্রমাগত তার অহং থেকে মুক্ত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল অভিনীত চরিত্রের মধ্যে। ব্যক্তিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় সে। আধুনিক সভ্যতা প্রতিমুহূর্তে তা নষ্ট করে দিচ্ছে। ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক করার নামে ব্যক্তির আত্মিক শক্তির বিকাশে ব্যাঘাত ঘটায়। এরপর আসে ভয়ঙ্কর রাত্রি। টি ভি-র পর্দায় বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধ ঘোষণা হয়। সবাই আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে। হতাশায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডার বলে ওঠে, এই দিনটির জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। সে জানত এরকম একটা মুহূর্ত আসন্ন। চোখের সামনে রঙিন, বিবর্ণ ক্ষণস্থায়ী ইমেজ ভেসে ওঠে। জনমানবহীন বরফ আচ্ছাদিত মৃত্যু উপত্যকা, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে বেঁচে ওঠার জন্য মানুষের উদভ্রান্ত প্রচেষ্টা। নিদ্রিত গোসেনের শয্যা কক্ষ। ঘুমন্ত আলেকজাণ্ডারের পাশে ঘাসে বসে আছে আদেলেইদ। কন্যা মার্তা নিরাবরণ অবস্থায় করিডোর দিয়ে মুর্গি তাড়াতে তাড়াতে চলে যায়। অ্যাডোরেশন অফ দ্য ম্যাজাই। ছবি শুরুও হয়েছিল দ্য অ্যাডোরেশন অফ দ্য ম্যাজাই থেকে। তখন বাখের এক বিষণ্ণ সঙ্গীত বাজছিল। মেরির কোলে যিশু, সে তার ছোট্ট কোমল হাত বাড়িয়ে ছুঁয়েছে রাজার হাতে ধরা এক পাত্রকে। জাগতিক সমস্ত ভাল-মন্দের মাঝেও নির্মল সরলতা। যিশুর আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে একটা সময় পৃথিবী ধর্মীয় পাপাচার থেকে মুক্ত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার এই রাত্রে সমস্ত মানবজাতি এবং সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য আত্ম-নিবেদনের অঙ্গীকার করে—প্রভু, এই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত থেকে আমাদের বাঁচাও। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে মুক্ত কর। আমার সমস্ত কিছুকে আমি পরিত্যাগ করব। যে পরিবারকে আমি ভালবাসি, আমার শিশু পুত্র তাকে ছেড়েও আমি চলে যাব। আমি মৌন হয়ে যাব। আমার ঘর বাড়ি,মূল্যবান আসবাবপত্র সব ধ্বংস করে ফেলব। যা কিছু আমাকে জীবনের প্রতি আসক্ত রাখে সব কিছু আমি ত্যাগ করব। যদি তুমি যা কিছু যেমন আছে তেমনি রেখে দাও। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে একদিন মানুষেরই আত্মদান ছিল আর আজকের আসন্ন ধ্বংসের অগ্রগতি প্রতিরোধে আলেকজাণ্ডারের আত্মদানের অঙ্গীকার। লিওনার্দোর ছবি এবং যিশু যেমন দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উপস্থিত তেমনি তাৎপর্যময় এবং ব্যঞ্জনা-পূর্ণ ছবির সমগ্র প্রকৃতি এবং সত্বা। অটো অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগী

হতে ইতিহাস শিক্ষকের চাকরি ছেড়েছে। অবসর সময়ে পোস্টম্যানের কাজ করে। আলেকজাণ্ডারের জন্মদিনে সে একটি সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের মানচিত্র উপহার দেয়। অ্যাডোরেশন অব্ ফ্রী কিং ছবি দেখে সে ভয়ে পাথর হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডারকে বলে, লিওনার্দো তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। অলৌকিক ঘটনার অনুসন্ধানকারী অটো জানায় আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচতে হলে এই রাত্রে আলেকজাণ্ডারকে পরিচারিকা মারিয়ার কাছে গিয়ে রাত্রি যাপন করতে হবে। কারণ সে জানে মারিয়া একজন জাদুকরী ডাইনী। সেই পারে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে। ভারাক্রান্ত আলেকজাণ্ডার লিওনার্দোর ছবি দেখতে দেখতে অটোর কথায় সংক্রামিত হয়ে হঠাৎ আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পায়। শান্ত সরল মারিয়ার মধ্যে সে খুঁজে পায় মাতা, প্রেমিকা, পরিত্রাতার মানসমূর্তি। উদভ্রান্ত আলেকজাণ্ডার ছুটে যায় মারিয়ার ঘরে। শোনায় বাগানের গল্প। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার কৃত্রিমতা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সারল্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। মারিয়ার কাছে সে ভালবাসার আবেদন জানায়। আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে। আসলে আলেকজাণ্ডারের ধারণা আর তার আতঙ্কিত মস্তিষ্কে আটকে থাকে না, বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ের উপলব্ধিতে পরিণত হয়ে যায়। সকাল হতেই সে পরিবারের সকলকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়িতে আগুন লাগায়। স্টিরিওতে চাপিয়ে দেয় জাপানি বাঁশির সুর। যে আলোর ঠিকানায় মানব সভ্যতার যাত্রার সূচনা হয়েছিল, সে আলোকপথের মাঝে জমেছে আঁধার; ছবি শুরুর দিনেও আলোয় ছিল না উজ্জ্বলতা, ছিল অস্পষ্ট আঁধারের আভাস। সভ্যতার অন্ধকারময় ভবিষ্যত আশঙ্কা আলেকজাণ্ডারের মনে জমাট বেঁধেছিল রাত্রে। যথার্থভাবে উপযোগী আলোছায়ার নিয়ন্ত্রণে বাঁধা দৃশ্যকল্প। রাত্রে আলেকজাণ্ডার আর অটো যখন দূর থেকে ভেসে ওঠা প্রকৃতির ধ্বনিময় ব্যঞ্জনা টের পাচ্ছে, তখন তাদের মতো আমরাও চলে যাই সেই বিলীয়মান স্বরে ভর করে সঙ্গীতহীন অদ্ভুত বিষাদময়তায়।

সেই বন্ধ্যাগাছকে ফলবতী করতে শিশুপুত্র গোসেনের অবিচল নিষ্ঠা, ছোট শিশু তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে ধীর পায়ে বয়ে নিয়ে আসে বালতি ভর্তি জল গাছটির কাছে। জল-সিঞ্চনের পর সে আশ্রয় নেয় গাছের নীচে। গাছের কোলে মাথা দিয়ে সে ওপরে তাকায়। ক্যামেরা গাছের কাণ্ড বেয়ে ধীরে টিল্ট আপ করে ন্যাড়া ডালপালার ওপর থামে। দূরে দেখা যায় সমুদ্রের নীল জল রেখা। বাকরুদ্ধতাকে ভেঙে গোসেন প্রথম কথা বলে।

মানব সভ্যতার ভবিষ্যত কোথায়, তার উত্তর খুঁজতেই আলেকজাণ্ডারের আত্মিক অনুসন্ধান। রাত্রি পার হয়ে ছবি শেষ হয় বৃষ্টিস্নাত দিনের আলোয়। যে অজ্ঞাত সত্যের জমি খুঁজে পেতে আলেকজাণ্ডারের আত্মাহুতি সেখানেই আর এক নবজন্মের অন্বেষণ। দূরে জল, ন্যাড়া ডালপালা, সম্ভাবনারই দ্যোতক, তারকোভস্কির ভাষায় খুবই সিনেমাধর্মী উপাদান, যা রহস্যময় ও গতি, গভীরতা এবং পরিবর্তনের বোধ চারিয়ে দেয়।

আধুনিক সভ্যতা, যন্ত্রজীবন, কৃত্রিমতা-পীড়িত যে জীবন থেকে মুক্তি পেতে আলেকজাণ্ডার পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, সেই পৃথিবীর চেতনা, তার দুঃসহ চাপ এড়িয়ে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে শান্তি পায়নি সে। এ শুধু যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতা, ধ্বংসোন্মুখী নয়। বীজ বাসা বেঁধে ফেলে মানুষের গভীর অন্তঃস্থলে। ধীরে ধীরে তা কুড়ে কুড়ে ক্ষয় করে তার সুস্থ চেতনা। তাই দেখি আলেকজাণ্ডার কেমন ভয়ের নিগড়ে আটকে পড়ে অস্থির হয়। ভারাক্রান্ত হয় তার ভিতরের দ্বন্দ্ব আর সংশয়ে। সমগ্র ছবি জুড়ে তারকোভস্কি সম্ভবত প্রশ্ন তোলেন যে, আধুনিক সভ্যতাই কি মানুষের মনে এমন সন্ত্রাস সঞ্চারিত করল, সভ্যতার অগ্রগতিতেই কি অন্তর্নিহিত রয়েছে বিধ্বংসী বীজ ? আলেকজাণ্ডার এই অগ্রগতির উপযোগী হয়ে উঠল নাকি সভ্যতার অস্থির গতিতে সে উদভ্রান্ত হয়ে নিজের বাড়িতে আগুন লাগাল ? 'স্যাক্রিফাইস' আলেকজাণ্ডারের আত্মাহুতির সরল কাহিনী নয়। তার অবস্থানও সময়ের সহজ পথে এগোয় না। সমস্ত ছবিটিকে এক অকৃত্রিম সারল্যের অনুসন্ধান বলে মনে হয়।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির চিত্রকলা যেমন ছবিটির প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ, তেমনি ছবির শব্দ সঙ্কলন, ক্যামেরার গতি, আলোকসম্পাত এবং বর্ণবিন্যাস সমগ্র ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আড়াইঘণ্টার ছবিতে সর্বমোট ১২৬টি শট। গোটা ছবিটি তোলা হয়েছে সুইডেনের ম্লান আলোয় যেখানে দিনের আলোয় বাইরের দৃশ্যগুলিতে রয়েছে সামান্য বৈপরীত্য। ঘরের মধ্যেকার দৃশ্যগুলি রঙের দিক থেকে আরও প্রশমিত। শুরুর দৃশ্য ছিল কাট্ ছাড়া সাত মিনিট। ফাঁকা প্রান্তরের হাওয়ার শব্দ, শঙ্খচিলের ডাক সমুদ্রপারের থেকে ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়। ক্যামেরা ধীরগতিতে প্যারালাল ট্র্যাকিং এবং প্যান করে এক প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তোলে। শেষের দৃশ্যটিও দীর্ঘ ১০ মিনিটের। ক্যামেরার গতি আর ছবির ঘটনার গতি যেমন মিলেমিশে একাকার তেমনি তার আলো ও ছায়া, শব্দ ও নিঃস্তব্ধতা মিলেমিশে স্থাপত্যময় এক অবিস্মরণীয় শিল্প সৃষ্টি। □

—তপন মল্লিক

সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়

আন্দ্রেই তারকোভস্কি : একটি প্রাসঙ্গিক সাক্ষাৎকার

প্রয়াত চলচ্চিত্রনির্মাতা আন্দ্রেই আর্সেনইয়েভিচ্ তারকোভস্কি-র দুটি সাক্ষাৎকার একযোগে প্রকাশিত হয় 'Journal of Arts & Ideas'-এর ১৯৮৭-র জানুয়ারী—জুন সংখ্যায়। দুটিই তার আগে প্রকাশিত হয়েছিল পারি-তে—একটি ১৯৮৫-র ১০ই জানুয়ারি ও অপরটি, ১৯৮৬-র ১লা অগাস্ট। বর্তমান রচনাটিতে এই দুটি সাক্ষাৎকারের প্রথমটি অনূদিত হয়েছে।

□ আন্দ্রেই আর্সেনইয়েভিচ্, এরকম একটা প্রবণতা বা যুক্তিক্রম রয়েছে যে, স্রষ্টার কাছে তাঁর আগেকার কাজগুলি পুরোনো হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, তাঁর কাছে একমাত্র তাঁর সবচেয়ে হালের কাজগুলিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারটা ধরে নিলে, আপনার কোন ছবিগুলি আপনার নিজের সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে ?

□ জানেন, আসলে সাধারণতঃ আমার ছবিগুলি রিলিজ হয়ে যাওয়ার পর আমি আর তা দেখি না। প্রদর্শনীতে হলে একমাত্র তখনই দেখতে বাধ্য হই। কিন্তু এমনটা ঘটে খুবই কদাচিৎ···এতই কম যে আমি আমার আগেকার ছবিগুলি আর 'স্মরণেই আনতে' পারি না।

□ যাই হোক 'সোলারিস' কখনই আমার পছন্দসই ছিল না—এমনকী ছবিটির শুটিং শেষ করার সময়ও নয়। চলচ্চিত্রকে এই যে একটা আলাদা গোত্রের জিনিস হিসাবে আমি ভাবি, ধারণা অনুযায়ী সম্ভবতঃ, 'নস্টালজিয়া'ই (যেটি আমার এ-অবধি শেষ ছবি) আমার সবচেয়ে পছন্দসই ছবি। প্রথমতঃ, এ কারণে যে

এটিই আমার একমাত্র ছবি যার চিত্রনাট্যের নিজের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। এমনকী খুব এলোমেলোভাবে গড়ে তোলা ফিল্ম 'মিরর'-এও—একটিমাত্র বিষয়বস্তু কিছু নেই। শুধু একটি মানুষের জীবনের কালানুক্রম ছাড়া (যদিও ফিল্মের অবয়ব রচনা সংক্রান্ত ধারণার ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই একটি শক্তিশালী নির্ধারক)। তাহলেও ওই ছবিতে 'নস্টালজিয়া'র তুলনায় চিত্রনাট্যের ভূমিকা ছিল বেশি। 'নস্টালজিয়া'-র বিষয়বস্তুর বাস্তবিক কোন মানেই নেই। অন্তত ছবিটিতে বিশেষ কোন কিছুই ঘটছে না এই একেবারে শেষাংশের আগে—যখন দুজন বিশ্বাসী-ই মারা যাচ্ছে। এটা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত ছিল, দর্শকদের দিক থেকে এবং নাট্যরীতির দিক থেকেও।

তাই এ কথা বলার কোন মানেই হয় না যে 'নস্টালজিয়া' কোন সুসংজ্ঞাত কাঠামোর ওপরে রচিত হয়েছে। একজন ভাস্করের মডেলিং-এর জন্য একটা ফ্রেম বা কাঠামো যতটা দরকার, কতকটা সেরকমই নস্টালজিয়াতে দরকার হয়েছে নাট্যশৈলীর উপাদান। এর একমাত্র কাজ ছিল বিভিন্ন সব অংশকে এক জায়গায় ধরে রাখা। এইভাবেই তারা যাতে একটি আকার পায়।

□ আপনার কোন নির্দিষ্ট চিত্রনাট্য ছিল না বলছেন, সেক্ষেত্রে আপনি কি শুটিং-এর সময়ে কোনরকম ইম্প্রোভাইজ্ করেছিলেন ?

□ না, তা করিনি। 'নস্টালজিয়া' খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল একান্ত বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র-তত্ত্ব অনুসারে কিন্তু কোন নাট্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। আমার মতে ছবিটি খুবই সরল এবং কোনরকম জটিলতা বর্জিত। আর যেটা খুবই মূল্যবান তা হল ছবিটি যথেষ্ট বিনম্র, যদিও নিজের শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে কঠোর। আরও ভাল হতে পারত যদি পুরো অ্যাক্শন্টাই একটিমাত্র জায়গায় ঘটানো যেত। আমার পরের ছবিতে আমি এই চেষ্টাই করব—অবশ্যই স্থান-কাল ঐক্যকে ধরে রেখে।

'নস্টালজিয়া'-র আর যে ব্যাপারটা আমার ভাল লাগে তা হল এর শুটিং এর পদ্ধতিটা। ক্যামেরার পুরো কাজটাই আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে—মানে ক্যামেরার সবকটি চলন—এবং আলোকসম্পাত। যে সমস্ত ফ্রেমের মধ্যে ছবিটি রচনা করা হয়েছে সেগুলিও আমার ভাল লেগেছে। প্রসঙ্গতঃ, সেগুলির সংখ্যা খুবই কম ছিল।

□ সাধারণতঃ চলচ্চিত্র (এবং বিশেষ করে আপনার) কি কোন বিশেষ আদর্শগত বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত ? যেমন ধরুন, যখন আপনি সোভিয়েত ক্লাসিক ফিল্মগুলি দেখেন, তখন তাদের ভিতরের প্রচার কি আপনাকে বিরক্ত

করে—না কি আপনি সেগুলির থেকে নান্দনিক আনন্দ পান ?

□ প্রচার এক জিনিস, আর ভাবগত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আর এক। হয়ত আমাদের বিশেষ বিশেষ লালন-পালনের কারণেই আমরা ভাবগত বিষয়কে প্রচারের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলি। কিন্তু ভাবের কথা বলার সময় আমার মনের মধ্যে থাকে একটা কাজের অন্তর্গত বিষয়ের কথা। তার বিভিন্ন ভাব ও স্বত্বের কথা। আমি নিজেকে এমন একজন বলে মনে করি যে বেড়ে উঠেছে ধ্রুপদী শিল্পের মধ্যে, মানে সেই রকম (যদি এভাবে বলা যায়) শিক্ষাদীক্ষা ও চেতনার মধ্যে। আর বলব যে, সর্বোপরি, আমি আমার কাজের সঙ্গে চলচ্চিত্রতত্ত্বের কোন সহজ সরল সম্পর্কস্থাপনকে স্বীকার করি না—আর, এটা একটা সমস্যা—কারণ দেখেছি প্রত্যেকে চেষ্টা করেন আমার কাজের সঙ্গে কোন 'পূর্বসূরী'-র কাজের সমান্তরালত্বগুলি খুঁজে বের করতে। অবশ্য সাধারণভাবে এসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তার পরেই এঁরা ধরুন দোভ্‌ঝেনকোর আগেকার ফিল্মগুলির প্রতি আমার ভালবাসার স্বীকৃতিকে ব্যবহার করতে শুরু করেন এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য যে আমি নাকি দোভ্‌ঝেন্‌কোর শিষ্য। এই সিদ্ধান্ত, বলা বাহুল্য, ভুল কারণ এমন কিছু নেই যা আমি ও দোভ্‌ঝেন্‌কো দুজনেরই চলচ্চিত্রতাত্ত্বিক শৈলীর মধ্যে রয়েছে। আমি বরং উনিশ শতকের সাহিত্য, কাব্য ও কৃষ্টির আরও বেশি কাছের এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকের দর্শন-চিন্তার।···এখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমি অবশ্যই ভাবগত বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

'ব্যাটল্‌শিপ পোতেম্‌কিন্‌'-এর অন্তহীন রক্তপাতে আমি আহত হই। আমার মনে রেখাপাত করে এই রক্তপাত যা জনসাধারণের এক সুখকর জীবন সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়। স্বভাবতই এতে আমি আহত হই। যে সুখকর জীবন রক্তপাতের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে আমি অবিশ্বাস করি। রক্ত শুধু আরও রক্তই চায় এবং আর কোন কিছুই না। কিন্তু, আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটল্‌শিপ্‌ পোতেম্‌কিন্‌'-এ আরও একটা জিনিস আছে যা আমাকে খুবই আহত করে। সেটা হল এর এই সৃষ্টিশৈলী যা দর্শককে বাধ্য করে একে একটি স্লোগান হিসাবে দেখতে। ('আমার কাজই হল আমার স্লোগান'।) 'ব্যাটল্‌শিপ্‌ পোতেম্‌কিন্‌ হল' একটি স্লোগান এবং শুধুমাত্র এই একটি ব্যাপারই যথেষ্ট আমাতে বীতস্পৃহ করে তুলতে। দেখুন আমার মতে একটি শৈল্পিক চিত্রকল্প-হল একটি স্লোগানের ঠিক যথাযথ বিপরীত বস্তু, যার ভাবগত বিষয় ও তাৎপর্য পুরোপুরি আলাদা···

আমি ভিয়াচেস্‌লাভ্‌ ইভানোভ্‌-এর 'প্রতীক' সম্পর্কিত ধারণার আরও কাছাকাছি (সে সময়ে শৈল্পিত চিত্রকল্পকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল 'প্রতীক')। যখন ভিয়াচেস্‌লাভ্‌ ইভানোভ্‌ শিল্পের এমন কিছুর কথা উল্লেখ করেছিলেন যা অবিভাজ্য এবং যার কোন স্পষ্টভাবে সংজ্ঞাপনীয় অর্থ নেই, তখন তিনি, আমার মনে হয়, বলতে চেয়েছিলেন 'শৈল্পিক চিত্রকল্পে'র কথা, 'প্রতীকে'র কথা নয়। একটি চিত্রকল্প হল বিশ্বের এক অতলান্ত প্রতিফলন, যেখানে একটি প্রতীক, স্বত্বগত ভাবেই, হল একান্বয়ী ('মোনোসিম্যান্‌টিক্‌')। একে (একটি প্রতীককে) শেষ বিশ্লেষণে তার সাংকেতিক আবরণ থেকে বের করে এনে ব্যাখ্যা করা যায়। আর যখন কোন স্রষ্টা এই ধরণের কিছু সৃষ্টি করেন তা সঙ্গে সঙ্গেই একটা রূপক বা অ্যালিগরিতে পরিণত হয়, অর্থাৎ, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। এই ধরণের কোন 'প্রতীক' কখনই শিল্পের মধ্যে তার পূর্ণ সত্তা নিয়ে বাঁচতে পারে না—আর স্লোগান সম্পর্কে এ কথা তো আরও বেশি খাটে।

□ আপনার মত অনুযায়ী এ কথা কি বলা যাবে যে সিনেমার একটি সোভিয়েত স্কুল রয়েছে—একটি বিশুদ্ধ সোভিয়েত শৈলী—যেমন রয়েছে, ধরুন, সোভিয়েত কাব্যে? যদি তাই হয়, তাহলে আপনি কী ভাবে এই শৈলীর বর্ণনা দেবেন (মানে, আকারগত দিক থেকে নয়, বিশ্ববীক্ষার দিক থেকে)?

□ একথা সন্দেহাতীত যে একটা সময়ে সোভিয়েত সিনেমা বিশ্বচলচ্চিত্রের উপর বিরাট একটা প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। সুতরাং, অবশ্যই, সোভিয়েত শৈলীর একটা অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বা সময়ে আমি নিজেই বুঝতে পারি না এ কথার ঠিক অর্থ কী, বা এই প্রভাবের কারণগুলি কী কী। ধরুন, মার্ক দন্‌স্কোই-এর কথা—খুবই গুরুত্বহীন পরিচালক তিনি, অথচ তাঁর গোর্কি-ট্রিলজির মাধ্যমে পশ্চিমে বেশ একটা সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন। এর কারণ আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। ফ্রান্সে উনি প্রায় একজন ধ্রুপদী (ক্লাসিক) শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছেন। ব্যাপারটা হেঁয়ালি, তবু সত্যি। ইতালীয়রা তো আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দাবিই করে বসেন যে দন্‌স্কোই নাকি 'নব্য বাস্তবতাবাদ' (নিওরিয়ালিজম)-এর আবিষ্কর্তা। এটা অবশ্যই বিস্ময়কর। ওপর ওপর দেখলে, সোভিয়েত চিত্র-পরিচালকেরা সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের পশ্চিমী সহশিল্পীদের ভিতরের প্রবণতাগুলি আগে থেকেই কিছুটা আঁচ করতে। তাঁরা এই প্রবণতাগুলি অনুমান করেছিলেন এবং তারপর এগুলিকেই খানিকটা ধাক্কাটাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন···। সোভিয়েত শৈলী হল একটি বৈপ্লবিক শৈলী। একজন একথাও বলতে পারে যে এর ভিতর

একটা বৈপ্লবিক শুদ্ধতা রয়েছে, রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে এক ঋত্বিকের অকুণ্ঠ বিশ্বাস। এই শুদ্ধতা আর এই ইউটোপীয় বিশ্বাস দুটিই প্রবলভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমে যার ভিতর সিনেমাও পড়ে। এবং এর ফলে লোকজন, একেক সময়ে, অসাধারণ সব ফললাভ করতে পেরেছিল। সময়ের চলার সঙ্গে, এবং বিবিধ বলির সংখ্যা বাড়তে থাকা এবং একই সঙ্গে কিছু কিছু পরিস্থিতি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকায় এই প্যাথস্ জন্ম দিয়েছিল দ্ব্যর্থবোধ বা সংশয়ের। কিন্তু ততদিনে এই শৈলী ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছিল টিঁকে থাকার একমাত্র পন্থা।

আজকের সোভিয়েত সিনেমার ব্যাপারগুলি খুব, খুবই জটিল। সের্গেই পারাঝানোভ্ বা ওতার ইয়োসেলিয়ানির মতো ঘটনাকে সোভিয়েত যুক্ত-রাষ্ট্রের বাইরে কোনভাবেই আর ঘটতে দেখা যাচ্ছে না—তার কারণ এ নয় যে পশ্চিমে ভাল পরিচালকের অভাব আছে। তাঁরা রয়েছেন, কিন্তু যেটির অভাব ঘটছে তা হল, যদি এভাবে বলি—এই তীব্র স্বাধীনতা। পশ্চিমে এই জিনিসটা আগে ছিল, ভিগো-র মতো পরিচালকদের কাজের মধ্যে—যে ভিগোকে অনুসরণ করে এই গোটা 'নিউ ওয়েভ' স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসতে পেরেছিল···কিন্তু এ-ধরনের ব্যক্তির সংখ্যা কম। খুব কষ্ট করলে বিশ্বচলচ্চিত্রের পুরো ইতিহাসে হয়ত ডজন খানেক এই ধরনের পরিচালকের নাম গুণে পাওয়া যাবে।

তো, যাইহোক, আমি আবার বলছি যে আগেকার সোভিয়েত সিনেমা বিশ্ব চলচ্চিত্রে সত্যিসত্যিই একটা বিশাল প্রভাব ফেলতে পেরেছিল।

□ আপনার ছবিগুলিতে অনেক সময়েই আপনার পিতা আর্সেনই তারকো-ভস্কি-র কবিতা ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে। অবশ্যই আজকের দিনে তিনি সবচেয়ে বেশি খ্যাতিমান সোভিয়েত কবি। কথা হল, তাঁর কাব্য কি আপনাকে একজন ব্যক্তি হিসাবে বা একজন চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসাবে প্রভাবিত করেছে? আপনি 'মিরর', 'স্টকার' ও 'নস্টালজিয়া'-য় যে তাঁর কবিতা ব্যবহার করেছেন, এর কারণ কী?

□ 'মিরর'এ এসব কবিতা থাকাটা যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু ওই ছবিটা আত্ম-জীবনীমূলক এবং আমার জীবনীতে আমার বাবার কাব্যের একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে। ছবিটা আমাদের পারিবারিক সম্পর্কগুলি নিয়ে কিছুটা ব্যাপৃত হয়েছে এবং সে কারণেই কবিতাগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'স্টকার'-এ কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে অন্য উদ্দেশ্যে। বস্তুতঃ, ওই ছবিটায়

দুটি কবিতা রয়েছে—একটি আমার বাবার ও অপরটি ত্যুৎচিয়েভ্‌এর। দুটি কবিতাই ছবিটার অ্যাক্‌শনের প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোমার পক্ষে ভীষণভাবে জরুরী···তা ছাড়াও, আমি আমার বাবার কবিতাগুলি সত্যিসত্যিই ভালবাসি এবং এগুলি সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করি। আমার মতে তিনি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জীবিত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মান্দেল্‌শ্‌তাম্‌, আখ্‌মাতোভা ও কিছুটা পরবর্তীকালের পাস্তেরনাক্‌-কে নিয়ে আমাদের কাব্যের মূল স্রোতটি গড়ে উঠেছে। আমি আমার বাবার কাজকে এই স্রোতের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য করি—যে স্রোতটি আমার মতে রাশিয়ার ধ্রুপদী কাব্যের স্রোত।

□ আপনি বলেছেন যে একজন চিত্র-পরিচালক হিসেবে আপনার কাছে সাহিত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মতে সাহিত্য ও সিনেমার আন্তঃসম্পর্কটি কী? স্ক্রীন অ্যাডাপ্‌টেশন কথাটার মানে কী? এটা কি একটি কাহিনীর মধ্যে আরও কিছু প্রকাশ করার প্রয়াস, নাকি এখানে সাহিত্যিক কাজ আসলে এক সম্পূর্ণ নতুন শৈল্পিক বাস্তবতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি ভিত্তির আদল মাত্র?

□ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সিনেমার পর্দায় কোন সার্থক অ্যাডাপ্‌টেশনের জন্য পরিচালকের উচিত সাহিত্যকর্মটিকে শুধুই একটি উৎক্রমণ-বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করা, এমনভাবে যাতে নতুন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে। 'ইভান'স্‌ চাইল্ড্‌হুড্‌,' 'সোলারিস', 'স্টকার' এই প্রতিটি ছবিতেই তা হয়েছে। কিন্তু যদি ছবিগুলির সার্থকতার কথা ওঠে তাহলে দেখা যাবে এই সার্থকতার কারণ ছিল একমাত্র এটাই যে এই ছবিগুলির কোনটিতেই আমরা যান্ত্রিকভাবে লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিনি। এই প্রসঙ্গে বলি, এ কারণেই আমি 'সোলারিস' নিয়ে সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছি। আমি যে চিত্রনাট্য চেয়েছিলাম তাকে কখনই আমরা ব্যবহার করতে পারিনি। আমরা একটা চিত্রনাট্য লিখেছিলাম ঠিকই কিন্তু সেটা স্তানিস্লাভ্‌ লেম্‌-কর্তৃক খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল যে আমাদের চিত্রনাট্যটির সঙ্গে তাঁর উপন্যাসটির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। আমাদের চিত্রনাট্যে পুরো অ্যাক্‌শন্‌টাই পৃথিবীতে ঘটাবার কথা ছিল, এবং এসব নির্বোধসুলভ টেক্‌নোলজি বা কাল্পনিক অভিযান ইত্যাদির কোনকিছুই তাতে ছিল না। যে বিষয়টা নেওয়া হয়েছিল তা শুধুমাত্র মানুষের বিবেক—যে বিবেক হঠাৎ জেগে ওঠে এবং তার 'আধারের' ওপর তার প্রতিশোধ নেয়। লেম্‌-এর

উপন্যাসটি থেকে যে ভাবটুকু আমি ছেঁকে নিয়েছিলাম তা মোটামুটি এই-ই। যাই হোক, তিনি এই মত প্রত্যাখ্যান করেন এবং উপন্যাসটির ভাববস্তু তাঁর কাছে ভিন্নভাবে প্রতিভাত ; যেমন, যা অজ্ঞাত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ, দূর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অবধারণ-পদ্ধতি ইত্যাদির মতো কিছু। তিনি উৎসাহী সমাজতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ভবিষ্যততাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যেখানে এই দৃষ্টিকোণগুলির কোনোটিই আমাকে একটুও নাড়া দিতে পারেনি। ফলতঃ, আমাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধে।

আর, 'স্টকার'-এর জন্যে সবকিছুই পুনর্লিখিত হয়েছিল। মূল গ্রন্থটি থেকে যা নেওয়া হয়েছিল তা শুধুমাত্র ওই 'স্টকার'-এর জীবিকাটি—কিন্তু সেটিও ছবিটিতে অনেক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছিল। তাই এ অর্থে এ ছবিটিকে ঠিক অ্যাডাপ্টেশন হিসাবে ধরা যায় না। এর চিত্রনাট্য স্ত্রুগাৎস্কি-র 'রোড্-সাইড পিক্নিক্'-কে প্রায় স্পর্শই করেনি, যদিও বইটির নাম কৃতজ্ঞতা-স্বীকার অংশের অন্তর্ভুক্ত করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। এটা ছিল ওপরওয়ালাদের দাবি, যাতে করে ছবিটিকে স্পষ্টভাবে একটা কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীভিত্তিক ছবি বলে চালানো যায়।

আমার মনে হয়, সবথেকে ভাল অ্যাডাপ্টেশন সবসময়েই হয়ে দাঁড়ায় একটা নতুন কিছু, মূল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যার কোন সাদৃশ্যই থাকে না। কুরোসাওয়া শেক্স্পীয়রের 'ম্যাকবেথ্' এবং দস্তয়েভস্কির 'ইডিয়ট'-এর সবচেয়ে ভাল অ্যাডাপ্টেশন করেছেন। তিনি মূল পাঠ্যের ব্যাপারেও প্রচুর স্বাধীনতা নিয়েছিলেন এবং এমনকি অ্যাক্শনকেও আমাদের সময়ের মতো করে কালান্তরিত করেছিলেন। এর ফল হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে নতুন এক সৃষ্টি। আর এটাও দেখা যায় যে তিনি দস্তয়েভস্কি-র আরও কাছেই পৌঁছেছেন, অন্তত তাঁদের চেয়ে বেশিই যাঁরা তাঁর উপন্যাসগুলি শব্দ ধরে-ধরে পুনর্বিবৃত বা চিত্রিত করতে চেয়েছেন। তাই আমার মনে হয়, পর্দায় অ্যাডাপটেশনের ব্যাপারটি, তার বিশুদ্ধ অবয়বে, অর্থহীন।

□ আপনার 'আন্দ্রে রুবলভ'-ছবিটি বিরাট সাড়া পেয়েছিল। এ-বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক আজও চলছে। 'আন্দ্রে রুবলভ'-এ ইতিহাসের খণ্ডীকরণের বিরুদ্ধে, আপনার বিভিন্ন জোড়াতালি দেওয়ার বিরুদ্ধে, আমাদের ইতিহাসে রক্ষণশীল চার্চের গঠনশীল ভূমিকাকে এড়িয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে এবং ইত্যাদি যেসব নানা অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আপনার কী মনে হয় ?

□ আমি মনে করি না যে চার্চের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে আমার ছবিতে

ম্লান করে দেখানো হয়েছে। প্রথমত রুবলভ-স্বয়ং একজন সন্ন্যাসী, এবং পুরো ছবিটিতে এইটাই একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। কখন কখন বিষয়টিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকলেও, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রুবলভের ভাবনা যা পুরো ছবিটা জুড়ে রয়েছে তা তো চার্চেরই ভাবনা। এ কথা সকলেই জানে যে রুবলভ ছিলেন সের্গেই রাদোনেঝ্‌স্কি-র শিষ্য—যিনি তাঁর মধ্যে বিশিষ্ট খ্রীস্টীয় নীতিসমূহ সঞ্চারিত করেছিলেন।

ছবিটির অন্যতম প্রধান গল্পাংশটিতে দেখা যায় নগরপাল তুই যুবরাজ ভাইকে ভ্লাদিমির-এর কাছে আহ্বান করছে একটা সমঝোতার জন্য। অমন একটি সমঝোতা যে চার্চের গম্বুজের তলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটি নিশ্চয় যথেষ্ট অর্থবহ। শেষে চার্চ-ই আশীর্বাদ করে ও শুদ্ধি দেয় ছবিটির এই শেষ সৃষ্টি 'ঘণ্টা'টিকে। 'দি বেল'-এর এই শুদ্ধিকেই আমি ছবিটির সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পারম্পর্যগুলির একটি বলে মনে করি। এখানেই প্রকাশিত হয়েছে সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে আমার ধারণা এবং এছাড়াও পুরো ছবিটিতে সৃষ্টিশীল শিল্পের ভূমিকাটি —এখানে সৃষ্টিশীলতাকে দেখানো হয়েছে যত না জ্ঞানজাত তার চেয়ে বেশি সংজ্ঞানজাত এক ক্রিয়া হিসাবে। একমাত্র এই কারণেই অল্পবয়সী শিল্পীটি সক্ষম হয় একটি বিশাল ঘণ্টা নির্মাণ করতে, সেটির নির্মাণরহস্যের কোনরকম জ্ঞান ছাড়াই (যে রহস্য ছেলেটির বাবা ছেলেকে জানাবার আগেই মারা গিয়েছিলেন)। এখানেই প্রকাশিত হয় সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে আমার বোধ। আমার কাছে জ্ঞানের চেয়ে প্রেরণার গুরুত্ব অনেক-অনেক বেশি। আর, এই দৃশ্যে চার্চকে আবার উপস্থিত হতে দেখা যায়। লোকে এই ব্যাপারটা কী করে এড়িয়ে গেল আমি বুঝি না।

শেষ কথা হল আমার এই ছবিতে ফেওফান্ গ্রেক্ বা আন্দ্রেই রুবলভের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা সম্পর্কে আমার কোন দাবি নেই। বলা যেতে পারে যে ছবিটির উপজীব্য তাঁদের শিল্পকীর্তি সম্পর্কে আমার বোধ। এ কথা আরও বেশি খাটে এ কারণে যে আন্দ্রে রুবলভ সম্পর্কে প্রায় কোনকিছুই আজও জানা যায়নি। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের এই ছবিকে ইতিহাসের যত কাছে রাখা সম্ভব ছিল ততটাই কাছে রাখা হয়েছিল, অন্যথা আমরা ছবিটি করার অনুমতিই পেতাম না। এ নিয়ে অনেক অনুসন্ধান করেছিলাম আমরা, পড়েছিলাম চোদ্দ ও পনের শতকে রুস্‌কি ভাষায় লেখা যা-কিছু পাওয়া গেছে তার প্রায় সবই। এখানে ইতিহাস যতদূর অবধি ব্যাপৃত ছিল, আমি নিশ্চিত যে তার মধ্যে কোন বিচ্যুতিকেই

আমি ঘটতে দিইনি।

ছবিটা শেষ হলে, ইউ এস্ এস্ আর্-এর রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র সংস্থার বোর্ডের অনেক সদস্য একটা সম্মিলনী করেন। সকলেই ছবিটিকে সিনেমার একটি মহৎ কাজ বলে প্রশংসা করলেন। ছবিটা তন্মধ্যেই শেরেমেৎইয়েভো বিমানবন্দরের কাস্টম্‌সে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল কান্ চলচ্চিত্রোৎসবে পাঠানোর জন্য। আর ঠিক সেইসময়েই জনৈক সোভিয়েত চিত্রপরিচালক ফোন করলেন দিমিচিয়েভকে, যিনি তখন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিরজনৈক তাত্ত্বিক প্রবক্তা, এবং বললেন 'আপনারা কী করতে চলেছেন কমরেড ? আপনারা একটি রাশিয়া-বিরোধী, ইতিহাসবিরোধী এবং অ-দেশপ্রেমিক ছবিকে পাঠাচ্ছেন পশ্চিমি দুনিয়ার ফেস্টিভ্যালে ! তাছাড়া রুবলভ-এর ওপর এই ছবিটির ধারণা অগ্রসর হয়েছে পশ্চিমি পথ ধরে, অন্ততঃ একব্যক্তির প্রতি এর চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে।' আজ পর্যন্ত আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারিনি এইসব অভিযোগের অর্থ। কিন্তু পরে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই, দিমিচিয়েভ্ থেকে শুরু করে প্রত্যেকে ছবিটির সমালোচনা করেছেন। শেরেমেৎইয়েভো বিমানবন্দরের কাস্টম্‌স্ থেকে ছবিটি ফেরত নিয়ে আসা হয়েছিল। এরপর প্রায় ছ'-বছর ধরে আমাকে কোনও ছবি করতে ডাকা হয়নি।

আর, 'আন্দ্রে রুবলভ'-এর বিরুদ্ধে আগেকার এবং পরেকার অভিযোগগুলির সাদৃশ্য দেখেও আমি বিস্মিত হই। যেমন ধরুন, '...নায়কদের বদলে আমরা দেখি কর্দমাক্ত পথে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া ভাঙাচোরা, ফুরিয়ে-যাওয়া লোকজনকে। তাহলে এখানে রাশিয়ার শিল্প কোথায়, রাশিয়ার চেতনাই বা কোথায় ?'—কিন্তু, সেই যুগে সত্যিসত্যিই কোন ঐক্যসাধক চেতনার অস্তিত্ব ছিল না। সেই যুগের পুরো নাটকটাই ছিল এরকম—ঐক্য বলে কোন কিছু ছিলই না কোথাও। বাস্তবিক, রাশিয়ার আধ্যাত্মিক রেনেশাঁসের (আমি ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের কথা বলছি) শক্তিটা রূপ পেয়েছিল জনসাধারণের সার্বিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে—যে সার্বিক নিপীড়নের মূলে ছিল আত্মঘাতী যুদ্ধগুলো এবং আলোকপ্রাপ্ত কোন কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব। অপরদিকে ছিল এই তাতার আগ্রাসন। তাই এই রেনেশাঁসের ঠিক উল্টোদিকে রাখা যায় পশ্চিমি দুনিয়ার রেনেশাঁসকে—যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষ্টির প্রস্ফুটনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে পেরেছিল। রাশিয়ার ঘটনাটা ছিল ঠিক তার উল্টো। রুশীয় রেনেশাঁস এবং আধ্যাত্মিকতাকে বুঝতে গেলে এই ব্যাপারটা বোঝা খুবই জরুরি। তাই

যখন লোকে এসে আমাকে বলে, পরিস্থিতি যদি এতই খারাপ ছিল তাহলে কোন মহৎ সৃষ্টিও কি সম্ভব হতে পারত, আমি কোনভাবেই সেই মতে সায় দিতে পারি না। ওই পরিস্থিতির সমগ্র শক্তি আর সেই শক্তি যা আমাকে 'আন্দ্রে রুবলভ' সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছে, তারা নিহিত আছে জীবনের অবক্ষয় ও একই সঙ্গে সংস্কৃতির অগ্রগতির স্বত্বগত সহাবস্থানক্ষমতার ভেতরেই। এই সহাবস্থানক্ষমতার ভিতরেই সুপ্রচুর আশার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল—এবং আমার মনে হয়েছিল এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের অভীপ্সাগুলির প্রতি একধরণের দায়বদ্ধতা।

□ অনেকে মনে করেন যে বিংশ শতাব্দীতে শিল্পমাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র হয়ে পড়েছে যান্ত্রিকতাবাদী এবং সে জন্য আগেকার শিল্পশৈলীগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন। এইসব ধারণার মধ্যে কোন সত্য আছে কি ?

□ প্রশ্নটা এই নয় যে বিংশ শতাব্দীতে শিল্প ক্রমশই আরো বেশি প্রযুক্তি-নির্ভর হয়ে পড়তে শুরু করেছে কি না। যে কথাটা সন্দেহাতীতভাবে পরিষ্কার তা এই যে ইদানীংকার শিল্প আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর থেকে প্রায় পুরোপুরিই সরে গিয়েছে—অন্ততঃ মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক শিল্পে বা রেনেশাঁস যুগের বা এমনকি প্রাচীন রাশিয়ার শিল্পেও যে ভিত্তিটা ছিল সেই অর্থে। সেসব যুগে একজন শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম এবং একটি প্রার্থনার মধ্যে প্রায় কোন পার্থক্যই আনতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি নিজে থাকতেন উহ্য বা নামহীন।

আগেকার কালে, এই ব্যাপারটা ছিল মৌলিক এবং এর ভেতরে এক ধরণের আধ্যাত্মিকতা নিহিত ছিল, অর্থাৎ, যখন এক ব্যক্তি শিল্পসৃষ্টির ক্রিয়ার সামনে এসে হারিয়ে ফেলতেন নিজেকে। অবশ্যই এখনকার কথা আলাদা, এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সময়ে অবশ্যই আধ্যাত্মিকতার এক সম্পূর্ণ অভাব প্রদর্শিত হয়ে চলেছে। এটাই আমাদের বর্তমান শতাব্দীর সংস্কৃতির সব থেকে বড় সঙ্কট—তা সে চারুশিল্পের ক্ষেত্রে হোক, অথবা একটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে, অথবা একটি চলচ্চিত্রের।

আজকে শিল্পী যেসব কারণে শিল্পসৃষ্টিতে প্রবণ হন, সেগুলি আগেকার দিনের তুলনায় আলাদা। তাঁর সৃষ্টিশীলতার খোদ ভিত্তিটাই আজ আলাদা। আগেকার দিনে যদি এটা হতে পারত একটি প্রার্থনা, ঈশ্বরের সামনে একটি কর্তব্য সমাপন, কিংবা যে জনসমষ্টি শিল্পীর জন্মদাতা তার সামনে এবং সত্যের সামনে, এখন এই ধরণের 'শিল্পীসত্তা' শুধুমাত্র এক ধরণের বিশেষ অবস্থান (বা পোজিশন্), অনেকটা যেন কোন উত্তরাধিকারের মতো যা আপনি আত্মসাৎ করেন কোন

অধিকার ছাড়াই। আপনি ধনী এবং আপনি দেখিয়ে বেড়ান আপনার ধন-প্রাচুর্য। আপনি মেধা বা দক্ষতা অর্জন করেন এবং পরে তাকে সবরকমভাবে ব্যবহার করতে থাকেন যাতে আপনি আরও যশস্বী হতে পারেন, আরও আরও অর্থের মালিক হতে পারেন, ইত্যাদি।

কিন্তু একবার শুধু মনে করুন মধ্যযুগের, সমসাময়িক জাপানি শিল্পদৃশ্যের কথা। এটা ছিল সেই সময় যখন মহান জাপানি শিল্পাচার্যগণ রাজা ও ধনী সামন্তদের দরবারগুলোয় তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি সৃষ্টি করে চলেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রভূত স্বীকৃতি, যশ প্রভৃতি উপার্জন করার পর হঠাৎই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ওইসব দরবারগুলো থেকে অন্তর্ধান করতেন। পরে তাঁদেরকে দেখা যেত অন্য কোন জায়গায় অন্য পরিচয়ে এবং তাঁরা এভাবে তাঁদের শৈল্পিক জীবনটি আবার নতুন করে গড়ে তুলতেন। এইসব নতুন জায়গায় তাঁদের কেউ-ই চিনত না এবং তাঁদের সৃষ্টি-শৈলী থেকেও তাঁদের পূর্ব পরিচয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যেত না—কারণ তাঁরা সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতি ও শৈলী নিয়ে কাজ করতেন। ফলে, তাঁরা প্রত্যেকেই এক জীবনেই একরকমভাবে চার-পাঁচটা আলাদা জীবন অতিবাহিত করতেন।

এমন কথা শোনাই যাবে না কোন সমসাময়িক শিল্পী সম্পর্কে, যাঁর এই মুহূর্তে প্রয়োজন যশ ও অর্থ। ইদানীং আধ্যাত্মিকতা, আত্মপ্রয়োগ এবং সৃষ্টি-শীলতার ক্রিয়াসমূহ সম্পর্কিত বোধের এক সার্বিক অনুপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। অথচ খাঁটি সৃষ্টিশীলতার জন্য আধ্যাত্মিকতা আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন। এইটি বাদ দিলে সমগ্র অস্তিত্বই বঞ্চিত হয় এক গতিময় শক্তি থেকে।......এইভাবেই আমি দেখি সমস্যাটাকে, আমাদের বর্তমান শতাব্দীতে সংস্কৃতির এই ট্র্যাজেডিকে। □

নব প্রয়াস

মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষণ কেন্দ্র

নতুন সেশনের জন্য ছাত্র নেওয়া হচ্ছে—

১০ আর্য সমিতি রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪

(আর্য সমিতির পিছনে)

ভর্তি হওয়ার সময়—বেলা দশটা থেকে দুপুর দুটো

WITH BEST COMPLIMENTS FROM ;

GAURISHANKAR & CO.

55, B. R. B. BASU ROAD,
MEHTA BUILDING
3rd Floor, Room—A-3
Calcutta-700 001

With Best Compliments from :

ANJALI
CHEMICAL & ALLIED INDUSTRIFS PVT. LTD.

Regd. Office : **64/11A Suren Sarkar Road**
Calcutta-700 010
Phone : 36-2592. 35-0853
MANUFACTURERS OF BASIC DRUGS

দেবল বসু

....

আন্দ্রেই আর্সেনইয়েভিচ তারকোভস্কি বিরচিত
'স্কাল্পটিং ইন টাইম' গ্রন্থটির পর্যালোচনা :

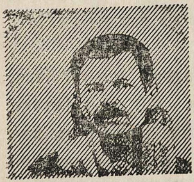

'গত সপ্তাহে চারবার আপনার' ফিল্ম দেখেছি। এটা শুধুই দেখা না; জীবন্ত শিল্পীদের সঙ্গে, জীবন্ত মানুষদের সঙ্গে কয়েকঘণ্টা বাস্তব জীবন যাপন করা……যা কিছু আমায় যন্ত্রণা দেয়, যা কিছু আমার নেই, যা কিছুর জন্য আমি উন্মুখ, যা কিছু আমায় ক্রুদ্ধ করে, অসুস্থ করে তোলে, শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়, যা কিছু আমায় আলো আর উষ্ণতার অনুভূতি দেয় এবং যার দ্বারা বেঁচে থাকি, আর যা কিছু আমায় ধ্বংস করে—সে সবই রয়েছে আপনার ফিল্মে ; যেন আয়নাতে আমি দেখছি। এই প্রথম কোন ফিল্ম আমার কাছে একটা সত্যবস্তু হয়ে উঠল, এবং এই জন্যই আমি এটা দেখতে যাই, সরাসরি এর ভিতরে চলে যেতে চাই, যাতে সত্যিসত্যি বেঁচে থাকার অনুভূতি পেতে পারি।'

তারকোভস্কিকে লেখা এক চাকুরিরতা রুশ মহিলার চিঠির অংশ। উল্লিখিত ফিল্মটি—'দ্য মিরর'।

আরেকটি চিঠি, অবসরপ্রাপ্ত রেডিও ইঞ্জিনিয়ারের, একই ফিল্ম সম্পর্কে : 'আপনার ফিল্ম দেখে আমি অভিভূত। বয়স্ক ও শিশুর অনুভূতির জগতে প্রবেশের যে ক্ষমতা আপনার, যেভাবে আপনি চারপাশের জগতের সৌন্দর্যকে দর্শকের অনুভূতিতে এনে দিতে পারেন, যেভাবে আজকের মেকি মূল্যবোধ-

গুলো তুলে ধরেন আপনি…তা একান্তভাবে আপনারই আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য।'

সোভিয়েতের বিজ্ঞান একাডেমির পদার্থবিদ্যা বিভাগের মুখপত্রের একটি লেখা, ঐ ফিল্মটি সম্পর্কেই : 'আমরা কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কী ভাবে তারকোভস্কি এমন দার্শনিক গভীরতায় পৌঁছে দিতে পারেন।…ফিল্মটির বিষয় মানুষ। যে মানুষটির নেপথ্য স্বর আমরা ফিল্মে শুনি সেই বিশেষ মানুষটিই শুধু নয়—যে কোন মানুষ, যে এই পৃথিবীতে বেঁচে আছে, যে এই পৃথিবীর অংশ এবং এই পৃথিবীও যার অংশ। ঐ ছবির বিষয় এটাই যে প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের জন্য তার অতীত ও ভবিষ্যতের কাছে দায়বদ্ধ।…এই ছবি দেখতে হয়, যেমনভাবে দেখি আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী, সমুদ্র বা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য।'

লক্ষণীয় যে, এই লেখাগুলিতে ব্যক্ত অভিমতগুলি প্রত্যেকটিই ভিন্নতর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে স্বতন্ত্র। এবং এইটাই এই চলচ্চিত্রকারের অভিপ্রেত যে, প্রত্যেক দর্শক নিজস্বভাবে তার চলচ্চিত্র দেখুক, নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বোধ ও উপলব্ধির জারকে তা আত্মস্থ করুক। দর্শকভেদে অশেষ ভিন্নতা সত্ত্বেও, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই চলচ্চিত্রের সংবেদনশীল দর্শকের তারকোভস্কির ফিল্ম দেখার অভিজ্ঞতা একটি বিন্দুকে স্পর্শ করে—যে বিন্দুতে তারকোভস্কির ফিল্ম এক অনন্য আবিষ্কার। এই আবিষ্কার সত্যের। এবং এই আত্মিক আবিষ্কারের বিন্দু বা মুহূর্তটিই সমস্ত শিল্প-সাহিত্যের অভীষ্ট লক্ষ্য। দুর্গম, অবিকল্প ও একক। এখানে পৌঁছনোর কোন কৌশলগত শর্ট-কাট নেই, কোন সাধারণ রাজপথও নেই। প্রত্যেক শিল্পীকে তার নিজস্ব পথ করে নিতে হয়। শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস যতটা এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর ইতিহাস তার চেয়ে বেশি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ইতিহাস। একজন সার্থক শিল্পী কী ভাবে তাঁর নিজস্ব শিল্প-মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছন, সেই যাত্রার বৃত্তান্ত যদি তিনি নিজস্ব আত্মিক তাগিদে লিপিবদ্ধ করে যান, তবে তার মূল্য সেই শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিসীম। তারকোভস্কির 'স্কাল্পটিং ইন টাইম' এমনই একটি বৃত্তান্ত। চলচ্চিত্র মাধ্যমের মৌলিক প্রকৃতি ও শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত নিয়মসমূহের এমন গভীর উদ্‌ঘাটনকারী ব্যাখ্যা, এককথায় চলচ্চিত্রশিল্পের এমন সার্বিক ও আত্মিক দর্শন, এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে এই আলোচকের জানা নেই। বার্গম্যানের ভাষায়, বহু চলচ্চিত্রকার যে প্রকোষ্ঠের চাবি খুলতে শুধু চেষ্টাই করেছেন, ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি, সেখানে অবধি বিচরণ করেন যিনি, সেই তারকোভস্কি, কী ভাবে, কোথায়, কোন সে অলৌকিক চাবি পান,

তারই আভাস মেলে এই বৃত্তান্তে। প্রায় আড়াইশো পাতার এই অনবদ্য গ্রন্থের আনুপূর্বিক পরিচয় দেওয়া এই আলোচনার পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে আমরা চলচ্চিত্র সম্পর্কে তারকোভস্কির অভিজ্ঞতা, ধ্যানধারণা ও উপলব্ধির মূলধারাটি চিনে নেবার চেষ্টা করতে পারি।

॥ এক ॥

তাঁর প্রথম ছবি 'ইভান'স চাইল্ডহুড' তৈরি করার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারকোভস্কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, চলচ্চিত্র তার স্বধর্মেই কাব্যের সমগোত্রীয়। সাধারণতঃ যে অর্থে বলা হয় অমুক ফিল্মটি 'লিরিক্যাল' বা 'কাব্যিক' সেই অর্থে নয়, আরও গভীর মনস্তত্ত্বগত অর্থে। এই সমধর্মিতার ব্যাখা করেছেন লেখক বিভিন্ন দিক থেকে। সাধারণতঃ বেশির ভাগ চলচ্চিত্রে নাটকের ধর্মই অনুসৃত : ঘটনা, চিত্রকল্প,রূপকল্প সবই সেখানে যুক্ত ও বিন্যস্ত হয় একটি প্লট বা কাহিনীর পরিকল্পিত ছক বা লজিক মেনে ; এমনকি যেখানে প্লট চরিত্র-নির্ভর সেখানেও জীবনের জটিলতা ব্যাখ্যার নামে একটি সাজানো যুক্তির ছক অনুসরণ করা হয়। অথচ চলচ্চিত্রের উপাদানগুলিকে শিল্পীর নিজস্ব চিন্তার স্বাভাবিক নিয়মে বিন্যস্ত করা যায়। এবং এখানেই রয়েছে চলচ্চিত্রের অপরিমিত সম্ভাবনার দরজা। মনস্তত্ত্বগতভাবে আমাদের চিন্তার উন্মেষ, বিকাশ ও গতিপ্রকৃতি তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিয়মের বশীভূত। কখন কখন তা বিশেষ ধরণের প্রকাশরূপ দাবি করে যা লজিকাল ভাবনার ছক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই ধরণের প্রকাশরূপই কাব্য, যেখানে চিত্রকল্প ও রূপকল্পগুলি যুক্ত হয়ে পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায়—চিন্তার নিজস্ব নিয়মে, কোন সাজানো যুক্তির ছক মেনে নয়। একটা ছোট্ট উদাহরণ মনে করা যাক :

'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকোনো উঠোনে ঝরে রোদ, বারান্দায় জ্যোৎস্নার চন্দন'।

চিত্রকল্প বা রূপকল্পগুলি পাঠকের মনে পারস্পরিক অনুষঙ্গের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কতগুলি অনুভূতি সৃষ্টি করে যা কোন ছকের সীমায় আবদ্ধ থাকে না, সঞ্চারিত ও অনুরণিত হতে থাকে। পাঠকের মন এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ নিয়ে বিভিন্ন অনুভূতিগুলোর সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ রূপ সৃষ্টি করে এবং তার থেকেই জন্ম নেয় সেই আবেগ যা এই কবিতা রচনার মূলে ছিল। এই আবেগই পাঠককে নিয়ে যায় সেই সত্যের দিকে যা কবির উপলব্ধিতে প্রতিভাত হয়েছিল। এই কাব্য-

প্রক্রিয়াকে আরও প্রত্যক্ষ, ব্যাপক ও গভীরভাবে কার্যকরী করার সম্ভাবনা রয়েছে চলচ্চিত্র-মাধ্যমে।

॥ দুই ॥

'স্কাল্পটিং ইন টাইম'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তারকোভস্কি তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির নিরিখে সাধারণভাবে শিল্প সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। শিল্প কী, এর উদ্দেশ্য কী, আমাদের এতে কী প্রয়োজন, ইত্যাদি। স্বভাবতঃই এখানে নন্দনতত্ত্বের আলোচনা এসে পড়ে। কিন্তু লেখক কোন দার্শনিক সিসটেম খাড়া করার চেষ্টা না করে, নিজস্ব মনন ও উপলব্ধি সঞ্জাত ধ্যানধারণা ও মতামতগুলি স্বাধীনভাবে, প্রাঞ্জল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সাহিত্য-চিত্রকলার দৃষ্টান্ত ও অন্যান্য শিল্পী দার্শনিকের মতামতের উল্লেখ করেছেন। এখানে লেখকের সেই সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও মতামতের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বা অবকাশ নেই। শুধু শিল্প সম্পর্কে তাঁর কেন্দ্রীয় মতটির উল্লেখ করব যা এই দার্শনিক চলচ্চিত্রকারকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

শিল্পকর্মের মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে তারকোভস্কি বিশ্বাস করেন—সপ্রাণ বস্তুর মতো, শিল্পকর্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ নীতির সংঘাতের মধ্য দিয়ে জন্মায় ও গড়ে ওঠে। এই বিরুদ্ধ শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই সেই শিল্পকর্মের মূল ভাবনাটিকে অসীম সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই মূল ভাবনাটি নিহিত থাকে ওই বিরুদ্ধ শক্তির ভারসাম্যের মধ্যে, কখনও তা সামনে এগিয়ে এসে আমাদের জানান দেয় না। এইজন্যই একটি মহৎ শিল্পকর্মকে কখনই পুরো 'বুঝে ফেলা' যায় না। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন শিল্পকর্মেরই একপেশে ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে লেখক বিভিন্ন প্রাজ্ঞোক্তি স্মরণ করেছেন। গ্রন্থের এক জায়গায় তারকোভস্কি রাফায়েলের ম্যাডোনা ছবিটি ও কারপাচ্চিওর চিত্র-কলার তুলনামূলক আলোচনায়, পুশকিন, টলস্টয়, বুনুয়েল, পিকাসো, লোরকা, দালি প্রভৃতি দিকপাল শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টান্ত সহযোগে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন : শিল্পের রূপকল্প কখন একপেশে হতে পারেনা।

বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে চলচ্চিত্র মাধ্যমের মৌলিক সত্তার অন্বেষণের মধ্য দিয়ে লেখক তার প্রতিপাদ্যটিতে পৌছন : শিল্পীর আত্মিক চেতনায় বিধৃত বাস্তব ও জীবন্ত 'সময়' যেভাবে চলচ্চিত্রের উপাদান সেভাবে অন্য কোন মাধ্যমে নয় ; এখানেই চলচ্চিত্রের অনন্যতা। গত শতকে লুমিয়ের-এর তৈরি ট্রেন আসার দৃশ্যের মধ্যেই চলচ্চিত্রের জন্ম। এই দৃশ্যের মধ্যেই রয়েছে একটি নতুন

নান্দনিক নীতির ভিত্তি। শিল্পের ইতিহাসে এই প্রথম 'সময়'কে তার বাস্তব ঘটনাময় রূপের মধ্যে উপস্থিত করা সম্ভব হল। বাস্তব ঘটনায় বিধৃত সময়—শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্রের এ যেন এক চূড়ান্ত সংজ্ঞা।

মানুষ চলচ্চিত্র দেখে : যে সময় বিলুপ্ত, অতিবাহিত অথবা অপ্রাপ্ত। এবং এই সময় নিয়েই চলচ্চিত্রের কাজ। একজন ভাস্কর যেমন তার শিল্পকর্মের একটি ধারণাকে মাথায় রেখে প্রস্তরখণ্ড থেকে যা কিছু অনাবশ্যক তা বাদ দিয়ে দেন, একজন চলচ্চিত্রকারও ঠিক তেমনি জীবন্ত ঘটনাময় একটি সময়খণ্ড থেকে যাবতীয় অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়ে তাঁর অভীষ্ট চলচ্চিত্রের উপাদান বা রূপকল্পটি বার করে নেন। চলচ্চিত্রকারের কাজটিকে, তাই বলা যায় 'স্কাল্পটিং ইন টাইম'—ঘটমান সময়ের ভাস্কর্য। এই জন্যই সময়ের বাস্তব ঘটমান মূর্ত রূপ থেকে চলচ্চিত্র যখনই প্রতীক, রূপক ইত্যাদির দিকে চলে যায় তখন তা চলচ্চিত্রের নিজস্ব মৌলিক প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যায়। চলচ্চিত্রে 'সময়' যে বাস্তব তথ্য বা ঘটনার রূপে হাজির হয় তা শিল্পীর পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞানের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। এই প্রসঙ্গে লেখক তাঁর 'আন্দ্রে রুবলভ' ছবির সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করেছেন।

॥ তিন ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে চলচ্চিত্রের স্বনির্দিষ্ট ভূমিকার আলোচনায় লেখক 'গণআবেদন' এর তত্ত্বটি খারিজ করেছেন। আগেই যেমন বলা হয়েছে, দর্শক চলচ্চিত্র দেখতে যায় তার অবলুপ্ত, অনতিবাহিত অথবা অপ্রাপ্ত সময়ের সন্ধানে। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষের আধুনিক অস্তিত্বের শর্তগুলো—কর্মব্যস্ততা, মানবিক সম্পর্কের গণ্ডিবদ্ধতা—মানুষের মধ্যে যে আত্মিক শূন্যতা সৃষ্টি করে তা পূরণের জন্যই মানুষ চলচ্চিত্র দেখতে যায়। এক্ষেত্রেও লেখক 'আন্দ্রে রুবলভ'-এর প্রসঙ্গ এনেছেন। এই সঙ্গে চলচ্চিত্রের 'নবতরঙ্গ' ধারার অন্তঃসারশূন্যতার দৃষ্টান্তে দেখিয়েছেন যে তাৎপর্যপূর্ণ ও সমসাময়িক হবার সচেতন প্রয়াসে একটি শিল্পকর্ম কখনই কালোত্তীর্ণ হতে পারে না, বরং উল্টোটাই হয়। চলচ্চিত্রের ক্রিয়া-কৌশলের ধারাটি পরিবর্তন-সাপেক্ষ, কিন্তু চলচ্চিত্রের নিজস্ব ধর্ম নয়।

পঞ্চম ও দীর্ঘতম অধ্যায়ে লেখক চলচ্চিত্রের রূপকল্প, সম্পাদনা-রীতি, চিত্রনাট্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মতামত ও উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন :

চলচ্চিত্রকার তাঁর বিশেষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে 'একখণ্ড সময়ের' ঘটমান

বাস্তবতা থেকে জীবন-সত্যের যে প্রতিবিম্বটি সৃষ্টি করেন তাই চলচ্চিত্রের ইমেজ বা রূপকল্প। এবং তা একক, অনন্য ও স্বপ্রকাশ। অর্থাৎ, চলচ্চিত্রীয় রূপকল্পগুলি যা কিছু প্রকাশ করে তার বাইরে তাদের কোন অর্থ থাকতে পারে না, এবং তা এতখানিই প্রকাশ করে যা কোনভাবেই কোন যুক্তির কাঠামোয় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এখানেই শৈল্পিক রূপকল্পের রহস্যময়তা, যার জন্য প্রত্যেকেই তার নিজের মতো করে এর মধ্য দিয়ে নিজস্ব উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারে। বিষয়টি লেখক খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন জাপানি হাইকু কবিতার দৃষ্টান্ত দিয়ে।

চলচ্চিত্রীয় রূপকল্পের অনন্য প্রকৃতির নিয়ামক হল সেই বিশেষ ছন্দ যা সময়ের মূর্ত রূপের বহমানতাকে প্রকাশ করে। লুমিয়ের এর তোলা ট্রেনের দৃশ্যটির কথা মনে করলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। 'ট্রেন এগিয়ে আসছে'—এই রূপকল্পটির মধ্যে রয়েছে সময়ের একটি ছন্দ। চলচ্চিত্রে সম্পাদনা এই ছন্দকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে, এর লয়কে বিষয়ের ভাব অনুযায়ী দ্রুত বা বিলম্বিত করতে পারে। এই প্রসঙ্গে লেখক সরাসরি খারিজ করেছেন আইজেনস্টাইন—কুলেশভ প্রবর্তিত মন্তাজ-চলচ্চিত্রের তত্ত্ব যাতে বলা হয় চলচ্চিত্রের আসল কাজটি হয় সম্পাদকের টেবিলে যেখানে দুটি ভাবোদ্যোতক শট যুক্ত করে একটি তৃতীয়, অন্যতর ভাব বা বক্তব্য সৃষ্টি করা যায় যা চলচ্চিত্রকারের বক্তব্য প্রকাশে সহায়ক।

ফিল্মে তোলা বিভিন্ন শট ও দৃশ্যের আদর্শ বিন্যাসই সম্পাদনা। আদর্শ বিন্যাসের মাপকাঠি কী? স্বতঃস্ফূর্ততা। বিভিন্ন শটের সময়ের ছন্দ এবং তাদের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি শুটিং এর সময়েই তৈরি হয়ে যায়। সম্পাদনায় এই যোগসূত্রটি অনুধাবন করে ওই শট ও দৃশ্যের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বচ্ছন্দ বিন্যাস ঘটান হয় যাতে বিভিন্ন শটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সময়ের ধারা একটি ধারাবাহিক ছন্দ সৃষ্টি করে। এই ছন্দ নির্ধারিত হয় শটের মধ্যে সময়ের ভিন্ন ভিন্ন 'চাপের' মাত্রা দিয়ে, সম্পাদিত শটের দৈর্ঘ দিয়ে নয়।

নদীর স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নলখাগড়ার কম্পন থেকে যেমন আমরা স্রোতের গতিবেগটি বুঝতে পারি তেমনই চলচ্চিত্রের শটের মধ্যে প্রতিবিম্বিত জীবনরূপ থেকে তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সময়ের গতিবেগটি অনুভব করতে পারি। সম্পাদনায় এই প্রবাহিত সময়ের ভিন্ন ভিন্ন চাপের মাত্রায় সমন্বয় ঘটিয়ে একটি ধারাবাহিক ছন্দ সৃষ্টি করা হয়। এই ছন্দের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত সময়চেতনাতেই একজন চলচ্চিত্রকারের স্বাতন্ত্র্য সর্বাধিক প্রকাশ পায়। এটি কোন ছকে ফেলে তৈরি করা যায় না, আঙ্গিকের কোন তত্ত্বের

ভিত্তিতে রচনা করা যায় না। এটি চলচ্চিত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে, চলচ্চিত্রকারের জীবনবোধের প্রতিক্রিয়ায়, সময়ের আত্মিক অন্বেষণ থেকে।

চিত্রনাট্য রচনা থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ একটি সমস্যাসঙ্কুল দুরতিক্রম্য পথ। এ পথে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা রয়েছে চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রের সম্পর্কের আলোচনায়।

॥ চার ॥

অন্যান্য বহুদর্শী চলচ্চিত্রকারের মতো তারকোভস্কিও মনে করেন, চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় সমস্যা রঙ, কারণ এটি, স্ববিরোধী শোনালেও, সিনেমার পর্দায় সত্যের আভাস সৃষ্টিতে একটি বড় বাধা। আজকের যুগে চলচ্চিত্রকে রঙিন হতে হয় যতটা নান্দনিক প্রয়োজনে তার থেকে বেশি বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। রঙ সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, যেটা সম্পর্কে আমরা বাস্তব জীবনে সাধারণভাবে আলাদা করে সচেতন থাকি না। চলচ্চিত্রে বাস্তবতার প্রতিবিম্ব দেখি বলেই সেখানে রঙ থাকলে তা আমাদের মনকে বাস্তবতা থেকে রঙের দিকেই বেশি আকর্ষণ করে ; একটি শটের রঙ-বাহার প্রায়শঃই সেলুলয়েড ফিল্মের প্রযুক্তিগত কারণে হয়ে থাকে এবং চলচ্চিত্রের রূপকল্পের দিক থেকে এটি একটি অনাত্মীয় কৃত্রিম উপাদান যাকে প্রতিহত করা ছাড়া উপায় নেই, যদি চলচ্চিত্রকারকে জীবনানুগ থাকতে হয়। রঙ যখন একটি শটের নাটকীয় উপাদান হয়ে ওঠে তখন সেই শটের ইমেজ বা রূপকল্পের নিজস্ব ব্যঞ্জনাটি রঙের তলায় চাপা পড়ে যায়। দর্শকের প্রতিক্রিয়া তখন বড়জোর এটাই হতে পারে : বাহ্, কী রঙ, কী ফটোগ্রাফি! এইজন্যই যাঁরা চলচ্চিত্রকে জীবনমুখি শিল্প হিসাবে সৃষ্টি করেন তাঁরা রঙকে তাঁদের চলচ্চিত্রে প্রায় নিষ্ক্রিয় রাখেন অর্থাৎ বর্ণালীর বিচ্ছুরণকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রায় এক বর্ণাভাসে নিয়ে আসেন। তারকোভস্কির নিজের ছবিতে আমরা আলাদা কোন রঙ দেখতে পাই বলে মনে হয়না, কিংবা বলা যায়, একটিই রঙ দেখি—জীবনের রঙ।

চলচ্চিত্রীয় অভিনয় সম্পর্কে তারকোভস্কির বক্তব্য যে কোন পরিচালকের প্রণিধানযোগ্য। চলচ্চিত্র-অভিনেতাকে চরিত্রের জীবনের উপস্থিত মুহূর্তগুলো সেই চরিত্রের মতোই তাৎক্ষণিকভাবে বাঁচতে হবে। চরিত্রের গোটা জীবনের ঘটনা জেনে ফেললে অভিনেতা কখনই চরিত্রানুগ হতে পারে না। লেখক তাঁর 'মিরর' ছবির একটি দৃশ্যের উদাহরণ দিয়েছেন। নায়িকা তার স্বামীর আসার অপেক্ষায় বসে আছে। এখানে অভিনেত্রী সমস্ত ঘটনা আগন্ত জানলে তার

অভিব্যক্তিতে সেই অপেক্ষমানতা ফুটে উঠবে না যা ভবিষ্যত সম্পর্কে স্বাভাবিক অনিশ্চয়তাবোধ থেকে আসে। স্বামীর সঙ্গে ভবিষ্যত সম্পর্কের ট্র্যাজেডি যদি অভিনেত্রীর চেতনায় থাকে তবে তার অভিব্যক্তিতে সেটা ফুটে উঠতে বাধ্য। তার অপেক্ষা যে নিষ্ফল—এই বোধ অবচেতনভাবেই সে প্রকাশ করে ফেলবে—যা চরিত্রের ঐ অপেক্ষার মুহূর্তের সত্যকে নষ্ট করে দেবে। আবার একটি চরিত্রের কী ও কেন ইত্যাদি বোঝারও কোন প্রয়োজন নেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর। বুদ্ধি দিয়ে একটি চরিত্রকে বোঝার চেষ্টা করতে গেলে অভিনেতা-অভিনেত্রী অবধারিতভাবেই সেই চরিত্র সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যায় একটি ধারণা সৃষ্টি করে নেবে যা চলচ্চিত্রকারের ধারণার সঙ্গে না মেলাই স্বাভাবিক। একটি চলচ্চিত্রের সবকিছুর দায়িত্ব যেহেতু শেষ পর্যন্ত পরিচালকের সেহেতু তিনি অভিনেতাকে তার নিজের মতো করে একটি চরিত্র 'বুঝে নিয়ে অভিনয়' করতে দিতে পারেন না। অভিনয় পরিচালকের কাছে একটি উপকরণ, এবং এটি তিনি যেমন চাইছেন তেমনটি আদায় করে নেবার জন্য বিভিন্ন ব্যবহারিক কৌশল প্রতি ক্ষেত্রেই খুঁজে নেবেন।

॥ পাঁচ ॥

পরের দুটি অধ্যায়ে রয়েছে চলচ্চিত্রকার ও দর্শকের সম্পর্ক এবং শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা। আর শেষ দুটি অধ্যায়ে 'নস্টালজিয়া' ও 'স্যাক্রিফাইস' এর মতো ছবির সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় শিল্পীর যে অভিজ্ঞান ও প্রতীতি কাজ করেছে তার ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে শিল্পীর আত্মোপলব্ধির একটি জগত উন্মোচিত হয়।

বইটির উপসংহারে আমরা দার্শনিক তারকোভস্কির অবস্থান চিনে নিতে পারি। বইয়ের প্রথম লেখার থেকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়, 'সাধারণভাবে শিল্প সম্পর্কে বা বিশেষভাবে চলচ্চিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলার চেয়ে আজ আরও জরুরি জীবন সম্পর্কে বলা···একজন শিল্পী হিসাবে এবং, সর্বোপরি একজন ব্যক্তি মানুষ হিসাবে, আমার করণীয় কী তা বুঝতে গিয়ে আমাকে তাকাতেই হয় আমাদের এই সভ্যতার সার্বিক পরিস্থিতির দিকে এবং একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশীদার হিসাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত দায়িত্বের দিকে।' এই আপেক্ষিক অবস্থানটি লেখক আমাদের চিনিয়ে দিতে চান এই উপসংহারে।

আধুনিক সভ্যতার একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আমরা যে সার্বিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছি—সামাজিক, রাষ্ট্রিক, পরিবেশগত, জাগতিক এবং আত্মিক বিপর্যয়ের মুখে—তা উপলব্ধি ক'রে লেখক আমাদের আস্থা রাখতে বলেন শিল্প-রূপকল্পে কারণ এখানেই প্রতিবিম্বিত হয় জীবনের সত্য, আদর্শ, নৈতিকতা, আশা ও প্রত্যয়। □

ভালবাসার উৎস এ শহরে শুকিয়ে যায়নি
মানস প্রতিবন্ধীর দিকে সহানুভূতির হাত প্রসারিত হতে দেখেছি
সেই তাঁদের কাছে আমরা একটু আশ্রয় চাই
আপনার অব্যবহৃত ঘর, অলস বৈঠকখানাটি আমাদের কাজে লাগাতে দিন
ত্রিশ চল্লিশ জন একটি ঘরে বসে পড়ছি, লিখছি, আঁকছি, স্থানাভাবে
বড় কষ্ট হচ্ছে সাধ্যমতো ভাড়া দিতেও রাজি
নীচের ঠিকানায় অনুগ্রহ করে জানান—

বিকাশায়ন
(মানস প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষণ কেন্দ্র)
১৪০/৬ সাউথ সিঁথি রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫০

With best compliments from :

Krishna Trading Corporation

Representatives of Newspaper & Periodicals.

1, GANESH CHANDRA AVENUE
(5th Floor)
CALCUTTA-700 013
Phone : 27-0828 / 26 0634

With best compliments from :

MICROSERVICES

(A Microventure in Computer Services)

1, PARK SIDE ROAD
CALCUTTA-700 026

Industrial Components

□ CONTROL DEVICES OF MATERIALS HANDLING EQUIPMENTS □

Brakes, Limit Switches, Controller, Master Controller, Selsyn Receiver/Transmitter, Cable Reeling Drum, Collector Column, Sampling Systems, Belt Scraper, Automatic Rail Clamp, Rotor Registor Unit.

Works & Office :
300, Roy Bahadur Road
Calcutta-700 053
Phone : 77-4125

City Office :
33/1, Netaji Subhas Road,
Room No.-832, 8th Floor
Calcutta-700 001
Phone : 20-6548/3911
Telex : 021-7290

যোগসূত্রের

সাফল্য কামনায়

জনৈক শুভার্থী

নতুন লেখক যোগসূত্রে একবাক্যে স্বাগত,
শর্ত মাত্র একটি : লেখার প্রকাশযোগ্যতা।
কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, ঠিকানা
লেখা খাম / পোস্ট কার্ড পাঠালে মতামত
জানানো হবে। হাতের লেখা
পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। লিখবেন
জায়গা ছেড়ে। অর্থাৎ দু-লাইনের
মাঝখানে এবং দুটি শব্দের মাঝে যেন
দরকারি ফাঁক থাকে। মনে রাখবেন
নতুন লেখক বলতে শুধু বয়স বা
ইতিপূর্বে লেখেননি এমন কিছু বোঝাচ্ছি না,
যিনি নতুন পথে, নিজের পথে
চলতে চাইছেন তাঁকে ঘিরেই
আমাদের আগ্রহ।

DEEKAY ENTERPRISE

House of quality Screen Printing

70A, S.N. Banerjee Road,
Calcutta-14, Phone: 24-4619

ADOLIN

(Baby Massage Oil)

Growth & Vigour of Babies, keeps skin smooth.
Protects Cough, Cold andSkin diseases.

NEVABACTRIN

(Antiseptic Oil)

Burns Boils, Carbuncles, Ear troubles,
Bedsore, Fresh wound,
Septic ulcers also Pox.

THE LIFE MEDICINES PVT. LTD

REGD. OFFICE:
BARASAT, PIN-743201
PH. 57-4450

CITY OFFICE:
160/1, B.B. GANGULY STREET
CALCUTTA-700 012

যোগসূত্র কুন্তল রায় কর্তৃক ৫, আব্দুল হালিম লেন, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে মুদ্রিত ও টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০০৫৯ থেকে প্রকাশিত।